ইবাদাতের মর্মকথা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া

ইবাদাতের মর্মকথা

মূল

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া

অনুবাদ ঃ এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

সম্পাদনা ঃ আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩২৩

২য় প্রকাশ
সফর ১৪৩১
মাঘ ১৪১৬
জানুয়ারী ২০১০

বিনিময় ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EBADATER MORMOKOTHA by Sykhul Islam Imam Ibn Tymia. Transilated by A. B. M. A. Khaleque Mojumder. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shrishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 80.00 Only

সূচীপত্র

ভূমিকা ---------- ৯
অনুবাদকের কথা ---------- ১০
ইবাদাতের অর্থ ---------- ১৩
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ---------- ১৩
আল্লাহ্‌র দাসত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ---------- ১৫
দীন এবং ইবাদাতের স্বাভাবিক সম্পর্ক ---------- ১৮
দীন এবং ইবাদাতের অর্থ বিশ্লেষণ ---------- ১৯
ইবাদাতের প্রাকৃতিক অর্থ ---------- ২৩
ইবাদাতের বিধিগত অর্থ ---------- ২৮
প্রাকৃতিক বিধান ও শরয়ী বিধানের মধ্যে পার্থক্য
না করার পরিণতি ---------- ২৯
জাবরিয়াদের ভ্রান্তি ও তার প্রতিকার ---------- ৩৯
একটি অভিযোগ ও তার জবাব ---------- ৫৩
সৃষ্টির কামালিয়াতের মাপকাঠি ---------- ৫৭
ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য ---------- ৫৮
সৃষ্টির কাছে চাওয়া নিষেধ ---------- ৬১
বিশেষ বিশেষ সাহাবার জন্য কিছু চাওয়া
অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ ছিলো ---------- ৬৩
আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে ---------- ৬৪
স্বভাবগতভাবে প্রত্যেক মানুষেরই ২টি জিনিসের প্রয়োজন ---------- ৬৫
গায়রুল্লাহর ভালোবাসাও গায়রুল্লাহ্‌র বন্দেগী ---------- ৬৭
এর অর্থ দুনিয়া ত্যাগ নয় ---------- ৭২
রাসূলের ভালোবাসার মূলকথা ---------- ৭৫
আল্লাহকে ভালোবাসার প্রকৃত নিদর্শন ---------- ৭৬
জন্মগতভাবেই মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী ---------- ৮০
অহংকার ও আনুগত্যের বৈপরীত্য ---------- ৮২
অহংকারের মধ্যে শিরকের অস্তিত্ব বিদ্যমান ---------- ৮৩
প্রত্যেক নবীর দীনই ছিলো ইসলাম ---------- ৮৭
ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম ---------- ৯০
আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণাংগ নমুনা ইবরাহীম (আ) ---------- ৯১

খুল্লাত শব্দের অর্থ ---------- ৯৩
মহব্বত আর খুল্লাতের মধ্যে পার্থক্য ---------- ৯৪
একটি ভুল ধারণার অপনোদন ---------- ৯৪
ঈমানের স্বাদ ও মজা ---------- ৯৫
আল্লাহর মহব্বতের ব্যাপারে চিন্তা ও আমলের ত্রুটি ---------- ৯৭
মহব্বতের সঠিক মানদণ্ড ---------- ১০০
দুনিয়া বিরাগীদের ভুল ধারণা ---------- ১০৪
শিরকের বিপদ ---------- ১০৫
শান ও সম্পদের ভালোবাসা ---------- ১০৬
গোটা মানবজাতি এ দুভাগেই বিভক্ত ---------- ১০৮
ওয়াহ্‌দাতুল ওয়াজুদের ফিতনা ---------- ১০৯
ফানাহ ---------- ১০৯
কামিল শাইখের সঠিক ব্যাখ্যা ---------- ১১৩
বিরহ মিলন ---------- ১১৫
যিকিরের শরীআত বিরোধী পদ্ধতি ---------- ১১৭
দীনের সঠিক পথ ---------- ১২০

ভূমিকা

মুসলিম জাহানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর আবির্ভাব এমন এক সময় ঘটে, যখন মুসলিম বিশ্ব ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিভিন্নমুখী আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত। বিশেষ করে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদাতের মধ্যে অনৈসলামিক চিন্তা চেতনা ও ভাবধারা মিশ্রণের মাধ্যমে মূল ইসলাম থেকে সুকৌশলে মুসলমানদের সরিয়ে নেয়ার যে ফিকরী আক্রমণ ইল্‌মী ময়দানে হচ্ছিল তার স্বার্থক মোকাবেলা করেছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ক্ষুরধার লিখনী। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার অসংখ্য কিতাব দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণে ব্রতী রয়েছে।

"আল উবূদিয়্যাহ" নামক আল্লামার এ বইখানা আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা অপরিসীম। কেননা ইবাদাত ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়ই শুধু নয়, বরং কুরআনের ঘোষণানুসারে একমাত্র ইবাদাতের জন্যই মহান স্রষ্টা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইবাদাতের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য, যাতে অন্যান্য ধর্মের শিরক মিশ্রিত ইবাদাতের ধারণা মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এ মূল্যবান বইখানা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন !

—প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

এটি শাইখুল ইসলাম হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইসলামী জাগরণের এ যুগে মুসলিম মিল্লাতের নিকট ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নাম আজ আর অপরিচিত নয়। তিনি মুসলিম মিল্লাতের গৌরবের ধন।

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের দেড়শ বছর পর হিজরী সাত শতকের শেষ ভাগে ইমাম ইবনে তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৬৬১ হিজরী মুতাবিক ১২৬২ ঈসায়ী সনে তাঁর জন্ম। ৭২৮ হিজরী মুতাবিক ১৩২৭ ঈসায়ী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। বিশ্ব মুসলিম ইতিহাসে জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য ধারা সৃষ্টি করেছেন।

মিল্লাতে মুসলিমাকে গোলামী থেকে নাজাত দেবার জন্য যে খিদমাত তিনি আনজাম দিয়েছেন, মুসলিম জাতি তা কখনো ভুলে যেতে পারবে না। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও রণকৌশল একদিকে মিল্লাতে মুসলিমাকে তাতারী বর্বরতা থেকে রক্ষা করেছিলো, আরেকদিকে তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ও অপরিসীম যোগ্যতা এ জাতিকে অসংখ্য বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর হাত থেকে হিফাজত করেছে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের সমর্থনে তাঁর জোরদার যুক্তি প্রমাণ ইমাম গাযালীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

বিদ'আত, মুশরিকী রুসুম-রেওয়াজ, আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম করেন। এ জন্য তাঁকে কষ্টও করতে হয়েছে অনেক। দুনিয়ার খ্যাতিমান, কীর্তিমান, জগত জোড়া ডংকার অধিকারী অনেক মনীষীও ইবনে তাইমিয়ার সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিনি ধর্মীয় রূপ ধারণ করে থাকা অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এসব সংস্কারমূলক কাজের সাথে সাথে তিনি তাতারীদের বর্বরতা ও পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

সে সময় মিসর ও সিরিয়া এ সয়লাবের আওতামুক্ত ছিলো। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেখানকার সাধারণ মুসলমান ও বিত্তশালীদের মধ্যে

আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলে তাদেরকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামান। রাষ্ট্রব্যবস্থার চাবিকাঠি জাহেলিয়াতের হাত থেকে ইসলামের হাতে আনার জন্যও তিনি ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেন।

তাঁর জন্মের যুগে তাতারীদের হামলায় সিন্ধু নদ থেকে ফোরাত নদীর তীর পর্যন্ত বিশাল ভূমিতে মুসলিম জাতি অবনতির চরম সীমায় গিয়ে পৌছেছিলো। পরবর্তীকালে নতুন তাতারী আক্রমণকারীরা ইসলাম কবুল করে নিলেও জাহেলিয়াতের ব্যাপারে তারা তাদের আগের শাসকদের চেয়েও বেশী অগ্রসর ছিলো। এসব শাসকদের প্রভাবে এসে সাধারণ মানুষ, আলেম সমাজ, পীর মাশায়েখ, ফকীহ, দরবেশ ও কাযীগণের নৈতিক মান আরো বেশী অধপতিত হয়ে পড়ে। তারা তাদের নিজস্ব সুযোগ সুবিধা পেয়ে অথবা শাসকদের রক্তচোখ এড়াতে গিয়ে দীনের ব্যাপারে দীন বিরোধী কথাবার্তা বলে। ফলে ফিক্হ ও কালাম শাস্ত্রভিত্তিক মাযহাবগুলো যেনো স্বতন্ত্র দীনে পরিণত হয়। ইজতিহাদ পরিণত হয় গুনাহতে। 'বিদ'আত' ও 'পৌরাণিক কাহিনী' শরীআতের বিধান হিসাবে রূপ লাভ করে।

সে সময়ের অশিক্ষিত ও গোমরাহ জনসাধারণ, দুনিয়ার সংকীর্ণ মনের আলেম সমাজ এবং মূর্খ ও যালেম শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াবার পথে বাধা দেয়া ছিলো কসাইর ছুরির নীচে গলা বাড়িয়ে দেয়ার শামিল। এ সময় নির্ভুল চিন্তার অধিকারী হকপন্থী ওলামার অভাব না থাকলেও সংস্কারের পতাকা উড্ডীন করার সাহস ছিলো না কারুর।

ঠিক এ সময়ে অমীয় তেজোদ্বীপ্ত ও অদম্য সাহসে ভর করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সব কুসংস্কারের বিরূদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। তাঁর লেখা 'আল উবূদিয়্যা' সে সময়কার জিহাদের ফসল। 'ইবাদাতের মর্মকথা' নামে গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করা হলো।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম মিল্লাত এ বইটি থেকে উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
তাং ১০/০৮/১৯৯১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ইবাদাতের অর্থ

"ইবাদাত" একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। এর মধ্যে আল্লাহর পসন্দনীয় ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের সব যাহেরী ও বাতেনী কথা এবং কাজ অন্তর্ভুক্ত। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, সত্যকথা, আমানতদারী, প্রতিবেশীর হক আদায়, মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহার, ওয়াদা পালন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, পাড়া প্রতিবেশী এবং ইয়াতীম মিসকীনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, অধীনদের সাথে ভালো আচরণ, আল্লাহর যিকির, তিলাওয়াতে কুরআন সহ সকল আমলে সালেহ ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, আল্লাহর প্রতি একমুখী ও বিনয়ী হওয়া, এখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সকল ভালো কাজই ইবাদাতের মধ্যে শামিল।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শুধু ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। যেমন কুরআন বলছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○ - الذريات : ٥٦

"আমি জ্বিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"-সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

যত রাসূল দুনিয়ায় আগমন করেছেন এ উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আগমন করেছেন। নূহ আলাইহিস সালাম নিজ জাতিকে উদ্দেশ করে বলেছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط - الاعراف : ٥٩

"হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী করো ; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।"-সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৯

হুদ আলাইহিস সালাম, সালেহ আলাইহিস সালাম, শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম—মোটকথা সকল নবী আলাইহিমুস সালাম তাঁদের নিজ নিজ জাতিকে এ আহবানই জানিয়েছিলেন।

কুরআন অকাট্যভাবে ঘোষণা করছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج-

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন পয়গাম্বর পাঠিয়েছি। তাঁরা মানুষের নিকট এ পয়গাম পৌছিয়েছে ঃ হে মানুষেরা ! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো।"

—সূরা আন নাহল ঃ ৩৬

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلآَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

"হে নবী! তোমার আগে আমি যেসব নবী দুনিয়ায় পাঠিয়েছি তাদের প্রতি আমি এ ওহীই নাযিল করেছিলাম। "আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত করো।"

—সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৫

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○ الانبياء : ٩٢

"নিসন্দেহে তোমাদের এই উম্মাহ একই উম্মাহ, আর আমিই তোমাদের সকলের 'রব'। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত করো।"

—সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯২

একথা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, এ আয়াতে "ইবাদাত করো" শুধু সাধারণ মানুষ অর্থাৎ উম্মতকে উদ্দেশ করেই বলা হয়নি। বরং এ দাওয়াতের দা'য়ী এবং পয়গামের মুবাল্লিগ আম্বিয়ায়ে কিরামও এর মধ্যে শামিল। অন্য জায়গায়ও এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

"হে রাসূলগণ ! পাক পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক আমল করো, নিসন্দেহে আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত।"

—সূরা মু'মিনূন ঃ ৫১

আর এক আয়াতে এ ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○ الحجر : ٩٩

"(হে মুহাম্মাদ !) আপনার রবের ইবাদাত করতে থাকুন। যতক্ষণ না নিশ্চিত ব্যাপারটির (মৃত্যু) সময় এসে যাবে।" –সূরা আল হিজর ঃ ৯৯

এ ইবাদাতকে আম্বিয়া ও মালায়িকার পরম গুণাগুণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُوْنَ ○ الانبياء : ١٩

"আসমান ও যমীনে যা যা আছে সবই তাঁর। যেসব (ফেরেশতা) তাঁর দরবারে আছে তারা কখনো ইবাদাত থেকে মুখ ফিরায় না। না তারা ক্লান্ত হয়। রাতদিন অনবরত তার পবিত্রতা বর্ণনা করে। এতে একটু অবহেলা প্রদর্শন করে না।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৯-২০

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ○

"যারা (ফেরেশতা) তোমার রবের নিকট আছে তারা কখনো তাঁর নাফরমানী করে না। তারা তাঁর গুণগান করতে থাকে, তাঁর দরবারে সেজদায় রত থাকে।" –সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৬

এর বিপরীত রয়েছে ওইসব লোক, যারা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে না এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করার পরিবর্তে অহমিকায় নিমজ্জিত হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ○

"যারা আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং হঠকারিতায় নিমজ্জিত হয়, তারা অবশ্যই বড় লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৬০

আল্লাহর দাসত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা

যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব করাই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, তাই এ উদ্দেশ্য পূরণ করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার উপায়। একজন মানুষের মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছার অর্থই হলো, তিনি তার কাজকর্ম দ্বারা ইবাদাতের উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন। তাই কুরআন পাকে দেখতে পাই,

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ স্নেহ-মমতা ও মান মর্যাদার সাথে স্মরণ করতে চান, তখন তিনি এ স্মরণের সময় 'আবদুন' শব্দের বিশেষণ দ্বারা তাদের স্মরণ করে থাকেন ঃ

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا۝ الدهر : ٦

"এটা একটি প্রবাহমান ঝর্ণা হবে। তা থেকে আল্লাহর গোলামরা তৃষ্ণা নিবারণ করবে। যেখানে ইচ্ছে তারা তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিতে পারে।"–সূরা আদ দাহর ঃ ৬

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ الفرقان : ٦٣

"রহমানের দাস হলো তারা, যারা যমিনের উপর বিনয়ের সাথে চলে।" –সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩

শয়তান নিজে অভিশপ্ত হবার কথা শুনার পর আল্লাহর নিকট আরজ করেছিলো ঃ আমি এর বদলা স্বরূপ তোমার বান্দাদেরকে মনোহারী লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বিভ্রান্ত করবো। তখন আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ۝ الحجر : ٤٢

"আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তবে যারা তোর কথা শুনবে তারা গুমরাহ হয়ে যাবে।"–সূরা আল হিজর ঃ ৪২

ফেরেশতাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝..................

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝الانبياء : ٢٦، ٢٨

"আর এ কাফিররা বলছে, রহমানের সন্তান আছে। আল্লাহ এসব ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তারা (তো ফেরেশতারা) আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। ....তারা আল্লাহর ভয়ে সদাসর্বদা কম্পিত থাকে।"
–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৬, ২৮

হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে নবুয়াত এবং খোদায়ীত্ব দুটোই দাবী করা হয়েছিলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ـ الزخرف : ٥٩

"সে তো একজন দাস ছাড়া আর কিছু ছিলো না। আমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছি।"–সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ৫৯

বস্তুত, মুসলমানরাও শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর 'আল্লাহর বান্দাহ' হবার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয় কিনা সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

لاَتَطْرِنِيْ كَمَا اَطْرَتَ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ - اِنَّمَا انا عَبْدٌ فَقُولُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ - الحديث

"আমার প্রসংশায় বেশী বাড়াবাড়ি করো না, যেমন নাসারা জাতি ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলো। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন দাস। অতএব আমাকে তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই বলো।"–আল হাদীস

কুরআন মাজীদে আল্লাহর খাস বান্দাহ ফেরেশতা ও অন্যান্য নবী আলাইহিস সালামের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও 'বান্দাহ' হিসেবেই সম্বোধন করা হয়েছে। মে'রাজের মতো আল্লাহর কুদরতের এত বড় ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً - .... الخ - بنى اسرائيل : ١

"অতি পূত-পবিত্র সেই সত্তা যিনি রাতের বেলায় তাঁর প্রিয় বান্দাকে নিয়ে ভ্রমণ করিয়েছেন.......।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ○ - النجم : ١٠

"অতপর তাঁর বান্দার নিকট যা ওহী করার ছিলো তা করেছেন।"
–সূরা আন নাজম ঃ ১০

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত ও তাবলীগের উল্লেখ করে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ○ الجن : ١٩

"আর এই যে আল্লাহর বান্দাহ যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো (নামাযে) তখন লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো।"–সূরা জ্বিন ঃ ১৯

কুরআন তার অস্বীকারকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এবং রাসূলে করীমের তরফ থেকে জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ص

"আমার বান্দার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি সে ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে—তাহলে এর মত একটি সূরা তোমরা রচনা করে আনো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩

দীন এবং ইবাদাতের স্বাভাবিক সম্পর্ক

কুরআন ও হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গোলামী ও বন্দেগী আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা এবং তাঁর সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ সোপান। এখানে একথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সকল শাখা প্রশাখাসহ গোটা দীনই "ইবাদাতের" মধ্যে গণ্য। সকল নবী আল্লাহর দীন শিখাবার জন্য এসেছেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি জায়গায়ই একথার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর নবীগণ যাদের নিকটই দীনের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকে فَاعْبُدُوْهُ "তাঁর ইবাদাত করো" বলে সম্বোধন করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, "দীন" আর "ইবাদাত" শব্দ দুটো একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দুটি পৃথক দিক। হাদীসে জিবরীলের দীর্ঘ হাদীসটি এ কথারই প্রমাণ।

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম একজন বেদুইনের বেশে রাসূলের নিকট এসে সাহাবায়ে কেরামের সামনেই তাঁকে কতিপয় প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন করলেন ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কি ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং সামর্থ থাকলে হজ্জ করার নামই হলো ইসলাম।

এরপর আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কাকে বলে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর একত্ব, তাঁর ফেরেশতা, অবতীর্ণ করা কিতাব, তাঁর প্রেরিত রাসূল, মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বারের জীবন, তাকদীরের ভালো ও খারাপ দিকের উপর মন থেকে বিশ্বাস স্থাপন করার নামই "ঈমান"।

এরপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন ঃ "ইহ্সান কাকে বলে ?"

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

এসব প্রশ্ন ও উত্তরের পর হযরত জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন ঃ

فَاِنَّهٗ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ۔

আগন্তুক ছিলেন জিবরীল আমীন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিখাতে এসেছিলেন।

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজগুলোকে দীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এ কাজগুলোর সমষ্টির নামই "ইবাদাত"।

দীন এবং ইবাদাতের অর্থ বিশ্লেষণ

এবার দেখা যাক "দীন" ও "ইবাদাতের" আভিধানিক অর্থ কি? দীনের আভিধানিক অর্থ বিনীতভাবে মাথা নত করা, নিজকে ছোট মনে করা। আরবরা বলে থাকেন ঃ

دِنْتُهٗ فَدَانَ۔

অর্থাৎ আমি তাকে অসহায়, অনুগত, বিনয়ী ও হুকুমের অধীন বানিয়েছি। আর সে ওইরূপ হয়ে গেলো।

نَدِيْنُ لِلّٰهِ ও نَدِيْنُ اللّٰهَ

অর্থাৎ "আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি এবং আমাদেরকে তাঁর সমীপে সমর্পণ করি।" অতএব "আল্লাহর দীন" অর্থ তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগী করা। তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করা এবং মাথা নত করা। "ইবাদাত" এর আভিধানিক অর্থই দীনের অর্থের কাছাকাছি। ইবাদাত শব্দের অর্থ নিজেকে ছোট জানা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। যে পথ বেশী বেশী চলাচলের কারণে পথচারীদের পদচারণায় দলিত মথিত হয়ে পরিষ্কার ও সমতল হয়ে যায় সে পথকে আরববাসীরা طريق معبد (অর্থাৎ চলাচলের সহজ পথ) বলে। কিন্তু শরীআতের পরিভাষায় ইবাদাতের অর্থ এর মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়। বরং নিজেকে ছোট জানা ও মাথানত করার সাথে সাথে এতে গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের সংমিশ্রণ আছে। অর্থাৎ শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর দরবারে চরম বিনয় ও তাঁর জন্যে পরিপূর্ণ ভালোবাসা—এ উভয়ের সমষ্টির নামই হলো 'ইবাদাত'। এ দিক দিয়েই আরবী ভাষায় تيم (তায়াম) শব্দ عبد (বান্দা) অর্থে ববহৃত হয়। تتيم ভালোবাসার শেষ স্তরের নাম। এর প্রথম স্তরকে علاقة দ্বিতীয় স্তরকে صبابة তৃতীয় স্তরকে عزام চতুর্থ স্তরকে عشق বলা হয়। এ কারণেই 'মুতিম' ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে প্রিয়তমের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তার পরিপূর্ণ অধীন ও গোলাম হয়ে যায়। এ 'মুতিম' ও 'তায়াম' শব্দাবলী عبد অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এর তাৎপর্য হলো, ইবাদাতের মধ্যে মহববতের বরং পূর্ণ প্রেমের অর্থ নিহিত আছে। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তির সামনে মাথা নত করে কিন্তু মহব্বত ও ভালোবাসার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা খারাপ মন নিয়ে নত করে অথবা কাউকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু তার সাথে বিনয়ের আচরণ করে না, তাহলে এ অবস্থায় তাকে عبد বা عابد বলা যাবে না ঃ যেমন কখনো কখনো পিতা পুত্রের সাথে অথবা বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহার করে।

'ইবাদাত' শব্দের এ ব্যাখ্যা সামনে রাখলে এ সত্য ও নিগূঢ় রহস্য নিজ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীআত আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে আমাদেরকে যে হুকুম দিয়েছে এবং যে জিনিসকে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছে, তার হক ততোক্ষণ পর্যন্ত আদায় হয় না যতোক্ষণ এর মধ্যে এ দুটো জিনিসের (বিনয় ও ভালোবাসা) সমন্বয় না ঘটবে। সেই সাথে আল্লাহকে দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে বেশী ভালোবাসতে ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বরং সত্য কথা তো হলো পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ বিনয় ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার তো একমাত্র আল্লাহরই। অনুরূপ ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য নাজায়েয। এভাবে এ ধরনের বিনয় ও ভালোবাসার প্রদর্শন বাতিল ও নাজায়েয গণ্য হবে যা আল্লাহর ফরমানের বাইরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ
نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط توبة : ٢٤

"হে নবী! বলো ঃ যদি তোমাদের মাতাপিতা, তোমাদের সন্তান সন্ততি, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, ওই সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো, ওই ব্যবসা যার মন্দা হবার তোমরা ভয় করো, আর ওই বাড়ী ঘর যা তোমরা খুবই পসন্দ করো, যদি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর চূড়ান্ত হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ২৪

এ আয়াত থেকে জানা গেলো প্রকৃত ভালোবাসা পাবার অধিকার আল্লাহ্ সোবহানাহু তাআলার। নবীকে ভালোবাসাও আল্লাহর আনুগত্যের শর্তে অন্তর্ভুক্ত। শরীআতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসা জরুরী। যেমন জরুরী তাঁর শর্তহীন আনুগত্য এবং সন্তুষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ ـ التوبة : ٦٢

"আল্লাহ্ আর আল্লাহর রাসূলেরই সর্বাধিক অধিকার রয়েছে, তারা তাঁদের সন্তুষ্ট করবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৬২

এভাবে হুকুম ও নির্দেশ দেবার মালিক দু'জনই। যেমন এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ لا ـ التوبة : ٥٩

"যদি এসব লোক আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল যে জিনিস তাদের দিয়েছেন তার উপর রাজী থাকতো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫৯

মনে রাখতে হবে, ইবাদাত ও ইবাদাতের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোর যেমন তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ইত্যাদিরও হকদার শুধু আল্লাহ্ই। আল্লাহর রাসূলও কোনো অবস্থাতেই এসব বিষয়ের সাথে শরীক নন। কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ ال عمران : ٦٤

"(হে নবী !) বলো ঃ হে আহলে কিতাব ! আসো আমরা এমন একটি কথায় একমত হই যা আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সমান। অর্থাৎ আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করবো, তাঁর সাথে কাউকে

শরীক করবো না। আমাদের কেউ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে 'রব' বানাবো না। তারপরও যদি তারা তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলমান।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

এখন উভয় ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত শুনুন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ لا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ لا اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ○ التوبة : ٥٩

"কতো ভালো হতো যদি এসব লোক সন্তুষ্ট থাকতো ওই জিনিসের উপর যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাদেরকে দান করেছেন। আর যদি বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি অচিরেই আমাদেরকে আরো অনুগ্রহ দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা আল্লাহর দিকেরই অনুরাগী।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫৯

কুরআনের এ আয়াত থেকে দুটো কথাই প্রমাণিত হলো। এখানেও আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ নিষেধের মালিক বলে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ع وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ع الحشر : ٧

"যে কথার হুকুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর যা তিনি নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকো।"–সূরা আল হাশর ৭

এ আয়াতেও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, অর্থাৎ আল্লাহই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সব কাজ সম্পন্নকারী। এ সত্যটিকেও একের অধিক আয়াতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ ال عمران : ١٧٣

"আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদেরকে ভয় করো। একথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেলো। উত্তরে তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ ـ الانفال : ٦٤

"হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬৪

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط الزمر : ٣٦

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন ?"-সূরা আয্ যুমার ঃ ৩৬

এখন আমি عبد ও عبادة এ দুটো শব্দের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করবো। عَبْدُ (আবদুন) শব্দটির দুটো অর্থ। প্রথম অর্থ হলো مُعَبَّدٌ আর দ্বিতীয় অর্থ হলো معبد ـ عابد অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালার অনুগত ও বাধ্যগত গোলাম। যারা আল্লাহর হুকুমের সামনে জন্মগতভাবেই মাথানত। আর আল্লাহ সোবহানাহু তা'আলা তার অবস্থা ও অবস্থানকে যেভাবে খুশী গড়ে তুলেন ও ভেঙ্গে ফেলেন বা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেন।

ইবাদাতের প্রাকৃতিক অর্থ

এ দিক দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণু কোনো 'শর্ত' বা 'কিন্তু' ছাড়াই আল্লাহর বান্দা। নেক্‌কার হোক কিংবা বদকার, মুনাফিক হোক অথবা কাফির, মুত্তাকী হোক কিংবা ফাসিক -ফাজির, জান্নাতী হোক অথবা জাহান্নামী, সবাই তাঁর সমান বান্দা বা দাস। কেননা আল্লাহ তাআলা সবার 'রব', মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। এদের কেউই আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বাইরে এক পা-ও বাড়াতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তা না হবার জন্য যতই আশা পোষণ করা হোক না কেন। এ সত্যটিই কুরআনে হাকীম এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ ال عمران : ٨٣

"তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আনুগত্যের বিধান অন্বেষণ করে ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁরই নির্দেশের অধীন অনুগত হয়ে আছে। আর মূলতঃ তাঁর দিকেই একদিন সকলকে ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

মোটকথা আল্লাহ তা'আলাই সকলের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা এবং জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনিই সকলের অন্তরকে ফিরিয়ে দেবার মালিক। সকলের পরিণাম পরিণতির অবস্থার ভিতর তাঁর ইচ্ছানুসারে হস্তক্ষেপকারী। তিনি ছাড়া তাদের কোনো রব, খালিক ও

মালিক নেই। একথা চাই কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, একথা সম্পর্কে কেউ অবহিত হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

দাস ও দাসত্বের এই অর্থের দিক থেকে ঈমানদার ও কাফির উভয়েই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু এর পরবর্তীতে গিয়ে দু'জনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের এক সরলরেখা টানা হয়ে যায়। ঈমানদারগণ একটি স্পষ্ট কথা ও ধ্রুব সত্যের জ্ঞান রাখে এবং সেই জ্ঞানের সাথে সাথে হৃদয়ের গহীনে তার উপর বিশ্বাসও স্থাপন করে। কিন্তু যারা ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত, তারা হয় সেই মহাসত্যের জন্য যে জ্ঞান দরকার সে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। অথবা জ্ঞান তো আছে বটে, কিন্তু তারপর তা মেনে নিতে অস্বীকার করে বসে। প্রকৃত পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে নিজের জ্ঞান-গরীমার বড়াই দেখিয়ে হঠকারিতায় নিমজ্জিত হয়। তাঁর সামনে মাথানত করার পরিবর্তে অহমিকা প্রদর্শন করে। যদিও ভিতরে থেকে তার মনও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের রিযিক দেন। জেনে অস্বীকার আর না জেনে অস্বীকার করা উভয় প্রকার মানুষই ঈমান ও কুফরের দিক থেকে একই অবস্থার অধিকারী। দু'জনই সমানভাবে সত্যের অস্বীকারকারী। একথা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে, দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা সত্য সম্পর্কে অবহিত হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। না, কখনো এমন নয়। আর যে জ্ঞান ঈমানের পথে পরিচালিত করে না, তাতো আরো বেশী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফিরআউন ও ফিরআউনের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○ النمل : ١٤

"তারা সরাসরি যুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো। অথচ তাদের মন এগুলোকে মেনে নিয়েছিলো। সুতরাং দেখো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কত ভয়াবহ।"
—সূরা আন নামল ঃ ১৪

এভাবে আহলি কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ط وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ البقرة : ١٤٦

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তো তাকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পারে যেমন চিনতে পারে নিজেদের সন্তানদেরকে। কিন্তু তাদের একটি দল জেনে বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৬

فَاِنَّهُمْ لَايُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ○ - الانعام : ٣٣

"কিন্তু তারা শুধু তোমাকেই অমান্য করছে না বরং এ যালেমরা মূলতঃ আল্লাহর বাণী ও তাঁর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করছে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৩৩

মোটকথা আল্লাহ্ বান্দার পরওয়ারদিগার, সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বাবস্থায়ই সে তাঁর মুখাপেক্ষী ও অনুগ্রহ্ লাভকারী। এ ধারণা বিশ্বাস ও স্বীকৃতিই বান্দার বন্দেগীর স্বীকৃতি যা আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবিয়াতের সাথে জড়িত। এ ধরনের আত্মসমর্পিত ব্যক্তি নিজের প্রকৃত 'রবের' সামনে প্রয়োজনের সময় চাওয়া পাওয়ার হাত প্রশস্ত করতে পারে, কাকুতি মিনতি করতে পারে, তাঁর উপর ভরসা করতে পারে। কিন্তু এরপরও তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প প্রমাণিত হয় না। তারা কখনো তাঁর হুকুম মানে, কখনো আবার মানে না। কখনো আল্লাহ্র দরবারে মাথা নত করে, আবার কখনো শয়তান ও প্রতিমার সামনে মাথা নুইয়ে থাকে। অতএব এ ধরনের বন্দেগী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শুধু 'রব' সিফাতের উপর ইলম ও ইয়াকীনের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে মু'মিন বলা যেতে পারে না। আর এ ব্যক্তিকে এ কারণে জান্নাতী বলেও গণ্য করা যাবে না। এ ধরনের ঈমান থাকা আর না থাকা সমান। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ○- يوسف : ١٠٦

"আর এদের অধিকাংশ তো আল্লাহর উপর এমনভাবে ঈমান পোষণ করে যে, সাথে অন্যকেও আল্লাহর শরীক করে।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬

বস্তুত মুশরিকরাও একথা অস্বীকার করতো না যে, আল্লাহ্ই সকলের খালিক ও রিযিকদাতা। কুরআনে কারীম কখনো এ ধরনের মু'মিনদেরকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকারকারী বলে অভিযুক্ত করে না। তাদের উপর অভিযোগ শুধু এই যে, তারা আল্লাহকে সকলের অস্তিত্বদানকারী, রিযিকদানকারী স্বীকার ও বিশ্বাস করার পরও অন্য শক্তিকে আল্লাহর বন্দেগীতে অংশিদার করে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج ـ العنكبوت : ٦١

"তুমি যদি এদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আসমানকে কে সৃষ্টি করেছে এবং চাঁদ ও সুরুজ কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে ? তাহলে তারা নিশ্চয় জবাব দেবে ঃ "আল্লাহ্।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬১

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○ ـ المؤمنون : ٨٤ـ٨٩

"তাদের জিজ্ঞেস করো এ যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার ? যদি জানো তবে বলো। এরা অবশ্যই জবাব দেবে, এসব আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা সতর্ক হও না কেন ? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো সপ্ত আকাশ ও মহান আরশের মালিক কে ? এরা অবশ্যই উত্তরে বলবে, 'আল্লাহ'। বলো, তাহলে তোমরা ভয় করোনা কেন ? তাদেরকে বলো, তোমরা যদি জানো তবে জবাব দাও, সকল জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব চলছে ? আর কে আছেন যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাকে আশ্রয় দিতে হয় না ? এরা নিশ্চয়ই বলবে, এটাতো আল্লাহরই কাজ। তাহলে তোমরা কি যাদুর কারণে ধোঁকায় পড়ে যাও ?"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮৪-৮৯

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হবার বিষয়টা এত স্পষ্ট সত্য যে, জেনে বুঝে যা কোনো মানুষ অস্বীকার করতেই পারে না। আল্লাহর ফরমাবরদার খাস বান্দাদেরই শুধু এ বৈশিষ্ট্য নয় বরং তাঁর বিদ্রোহী নাফরমান বান্দারাও এ সত্য স্বীকার করে। এমনকি অভিশপ্ত ইবলিসও আল্লাহর সাথে অনেক কিছুর শরীক করার পরও এ সত্যকে অস্বীকার করার সাহস পায়নি। এমনকি 'অভিশপ্ত' হবার শাস্তি শুনার পরও তার মুখ থেকে সর্বপ্রথম একথা বের হয়ে এসেছে ঃ

رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ○ - الحجر : ٣٦

"সে বলল, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! যদি তা-ই হয় তবে আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন সব মানুষকে উঠানো হবে।"–সূরা আল হিজর ঃ ৩৬

رَبِّ بِمَاۤ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ○

"ইবলিস বললো, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! যেমন করে তুমি আমাকে গুমরাহ করেছো তেমন করে আমিও এখন পৃথিবীতে তাদের জন্য চাকচিক্যের সৃষ্টি করে তাদের সবাইকে গুমরাহ করে দেবো।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৩৯

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ○ - ص : ٨٢

"সে বললো, তোমার ইয্যতের কসম খেয়ে বলছি, আমি এসব লোককে বিভ্রান্ত করবো।"–সূরা সাদ ঃ ৮২

এ সহ আরো অসংখ্য আয়াতের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শয়তান আল্লাহকেই প্রভু প্রতিপালক স্বীকার করে প্রকাশ্যভাবে, অন্য কাউকে নয়। আর এভাবে জাহান্নামবাসীরাও এ ধরনের স্বীকার উক্তিতে কারো থেকে পিছিয়ে থাকবে না। তারা একথা স্বীকার করবে যে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ○ - المؤمنون : ١٠٦

"হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। সত্যিকারেই আমরা গুমরাহ লোক ছিলাম।"

–সূরা আল মুমিনূন ঃ ১০৬

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط - الانعام : ٣٠

"আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এটা (জাহান্নামের সাজা) কি সংঘটিত হওয়া সত্য নয়? তারা তখন জবাব দেবে ঃ হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক ! এটা সংঘটিত হওয়া অবশ্যই সত্য।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩০

অতএব যে ব্যক্তি এ সত্যে উপনীত হয়ে থেমে যায় এবং ওই ইবাদাত যার সাথে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়াতের সম্পর্ক তার থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে শরীআতের বিধি পালন করে না এবং সেই ইবাদাতের অনুসারী হয় না। যার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার উপাস্য হবার

এবং রাসূলদের আনুগত্যের সাথে জড়িত। এমন ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই ইবলিস ও জাহান্নামবাসীদের চাইতে ভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব মানুষ ওদেরই দলভুক্ত। নিজের এ অবস্থা সত্ত্বেও যদি কেউ নিজের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা, নিকটবর্তী অলী, আরেফ এবং পূর্ণতা লাভকারীদের মধ্যে গণ্য, শরীআতের অনুসরণ করার দায়-দায়িত্ব তার নেই। তাহলে এমন ব্যক্তি কাফির ও নাস্তিকের চেয়েও বেশী গুমরাহ। আর যে ব্যক্তি খিযির অথবা কোনো বুযুর্গ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তাঁরা শরীআতের হুকুম আহকাম পালন করার জন্য বাধ্য নয়। কারণ তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর রহস্যময় ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছেন। তাদের এ ধারণা আল্লাহ অস্বীকারকারীদের বক্তব্যের চেয়েও আরো বেশী অসার ও ভিত্তিহীন।

এটা হলো 'আব্দ' এবং ইবাদাতের একটা অর্থ। উপরে এ পর্যন্ত এগুলোর অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইবাদাতের এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর দাস বা আব্দ। কাফির, মু'মিন, এমন কি যেভাবে একজন নবী—ঠিক সেভাবে একটি শয়তানও আল্লাহর দাস। এ ধরনের দাসত্বের দ্বারা পরকালের নাজাত ও সফলতা লাভের ব্যাপারে কোনো উপকার হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আরো আগে অগ্রসর হয়ে ইবাদাত বা দাসত্বের দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে 'আব্দ' বা দাস না হতে পারবে।

ইবাদাতের বিধিগত অর্থ

'আব্দ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো 'আবেদ'। অর্থাৎ এমন দাস যারা শুধু আল্লাহরই হুকুম পালন করে। আর কারো হুকুমের সামনে তারা মাথা নত করে না। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম নির্দেশের অনুসরণ করে। তারা সৎ ও মুত্তাকী বান্দাদের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তারা নাফরমান ও বিদ্রোহী বান্দাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ ধরনের বান্দাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি গণ্য হতে পারে না, যে আল্লাহর প্রভু প্রতিপালক হওয়াকে তো মানে, কিন্তু তার ইবাদাত ও আনুগত্য করে না। অথবা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোনো ইলাহর দাসত্ব করে। কেননা কোনো সত্তাকে ইলাহ মানার অর্থ হলো, মানুষের হৃদয়মন পূর্ণ একাগ্রতা ঐকান্তিকতা, ভালোবাসা ও পূর্ণ মাত্রার সম্মানবোধ, ভয়-ভীতি, আশা-নিরাশা, সবর-শোকর, নৈকট্য ও তাওয়াক্কুলের গভীর আবেগানুভূতির সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়া। অতএব যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়াও

অন্য কাউকে 'মাবুদ' ও 'ইলাহ' বানিয়ে নেয়, তখন তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে নিজের আনুগত্যের আবেগানুভূতি ও ঐকান্তিকতা ও ভালোবাসার উপলব্ধিকে বিভক্ত করে দেয়। তখন সে আর শুধু আল্লাহর ইবাদাতগুযার হিসেবেই অবশিষ্ট থাকে না। বরং অবস্থা প্রকৃতপক্ষে এমন হয়ে যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তি সাধারণত নিজের সকল কামনা বাসনার বিষয় গায়রুল্লাহর নিকট সমর্পন করে বসে।

আল্লাহর দাস ও দাসত্বের এ ধারণা আল্লাহ তা'আলার 'ইলাহ' হবার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ তাঁকে 'ইলাহ' মানার মাধ্যমেই তাঁর দাস ও দাসত্বের দাবী পূর্ণ করা সম্ভব। এ জন্যই তাওহীদের মূল শিরোনামই হলো—

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

এটাই হলো আল্লাহর দাস হওয়া এবং তাঁর দাসত্ব করার সেই ধারণা, আল্লাহর দৃষ্টিতে যা গ্রহণযোগ্য এবং প্রতিদান পাবার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার নিকট এরূপ দাসত্বেরই দাবী করেন। এ দাসত্বই তাঁর নেক ও বুযুর্গ বান্দাদের বিশেষ গুণাগুণ ও মর্যাদার প্রতীক। দাসত্বের এ ধারণার প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে দাস ও দাসত্বের প্রথম অর্থ এমন এক জিনিস, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে কাফির ও মু'মিন সকলে এক সমান। দাসত্বের এ অর্থের দিক দিয়ে একজন কাফিরও আল্লাহর সেরকম দাস যেমন একজন মু'মিন।

প্রাকৃতিক বিধান ও শরয়ী বিধানের মধ্যে পার্থক্য না করার পরিণতি

ইবাদাতের এ দুটো অর্থের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান তা বুঝার পর প্রাকৃতিক বিধান ও শরয়ী বিধানের পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। শরয়ী বিধান বলতে ওইসব কাজকে বুঝায় যেসব কাজ আল্লাহ তাআলার ইবাদাত, এতায়াত ও শরীআতের সাথে সম্পর্কিত। এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং এসব কাজ সম্পাদনকারীকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুত্বের সনদ দান করার মত গৌরবে গৌরবান্বিত করেন। আর প্রাকৃতিক বিধান হলো ওইসব কাজ, যেসব কাজের ব্যাপারে শয়তানের

বন্ধুদের ধারণা এবং আল্লাহর বন্ধুদের ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এসব বিধান মেনে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করে, এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে শরয়ী বিধানের জ্ঞান ও বিশ্বাসের বাস্তব আমল নিজের মধ্যে সৃষ্টি না করে তাহলে সে ব্যক্তি ইবলিসের অনুসরণকারীদের চেয়ে পৃথক নয়। ঠিক এভাবেই যদি কোনো ব্যক্তি শুধু প্রাকৃতিক বিধান মানে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন না চালায় বরং শরয়ী বিধানকেও মানে কিন্তু পুরোপুরী মানে না বরং কোনো কোনো ব্যাপারে এসব বিধানের আলোকে কাজ করে, আবার কোনো কোনো ব্যাপারে করে না, তবে এসব মানুষ আধাআধি ঈমানদার এবং আল্লাহর ত্রুটিপূর্ণ বান্দাহ। তার ঈমানের ওই পরিমাণ ত্রুটি ও কমতি আছে যে পরিমাণ সে দীনি বিধানের অনুসরণ করাকে পাশ কাটিয়ে ঈমান ও চরিত্রের দিক দিয়ে এসবকে অস্বীকার করে।

এটা শরীআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং নাজুক জায়গা। এ জায়গায় কত মানুষের পা সত্যপথ থেকে পিছলে দূরে সরে গেছে। বিশেষ করে এ জায়গায় সুফীকুল সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত হয়। এখানে এমন অনেক তরিকতের বুযুর্গ ব্যক্তিও টক্কর খেয়েছেন যাদেরকে হক অনুসন্ধানের ঈমান, তাওহীদ ও মারেফাতে ইলাহীর রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী বলা হতো। এরি প্রতি শেখ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইংগিত করে বলেছেন ঃ

> "অনেক লোক, আল্লাহর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বুঝার সৌভাগ্য লাভ করার পর ওখানেই থেমে গেছে। কিন্তু আমার অবস্থা এমন নয়। আমি যখন ওখানে পৌঁছেছি তখন আমার সামনে একটি দরজা খুলে গেছে। আমি তকদীরের সাথে সত্য লাভের জন্যে যুদ্ধ করেছি। পুরুষ সে-ই যে কদরের মুকাবিলা করে। সে পুরুষ নয়, যে তার সামনে আত্মসমর্পণ করে বসে।"

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর একথা প্রকৃতপক্ষে শরীআতের মূল দাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রাসূল আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করেছেন। কিন্তু অনেক লোকই এখানে পৌঁছে থেমে যায় ও হকের রজ্জুর মাথা তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। আর এটা এভাবে হয়, যখন সে সুলুকের ধাপগুলো অতিক্রম করে কাযায়ে এলাহীর নিকটবর্তী পৌঁছে যায় এবং সেখানে তার বা অন্যদের শিরক ও কুফরীর মত সকল গুনাহ ও অপরাধগুলো দেখে এবং তারা দেখে

যে, তাদের অপরাধ সংঘটিত হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাক্রমে একটি পূর্ণ নির্ধারিত ব্যাপার। অর্থাৎ তারা তাদের রবুবিয়াতের ফায়সালার ও ইচ্ছার মধ্যে শামিল, সন্তুষ্টির মধ্যে নয়, তখন তাদের বিবেক বিবেচনায় এ ধারণা চেপে বসে যে, ব্যস্ এখন যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে। তখন তারা তাঁর কাছে মাথা নত করে দেয়। বরং তার উপর রাজী থাকাই দীন, ইবাদাত ও তরীকত বলে মনে করে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন এ ধারণা কত বিপজ্জনক। এ ধারণা মুশরিকী ধারণা থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তাদের কথা ছিলো ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط - الانعام : ١٤٨

"আল্লাহ্ই যদি চাইতেন তাহলে না আমরা আর না আমাদের পিতৃপুরুষ শিরক করতেন ও কোনো জিনিসকে হারাম বলে নির্দিষ্ট করতেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪৮

لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط - الزخرف : ٢٠

"যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে আমরা এসব দেব-দেবীর পূজা করতাম না।"–সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ২০

اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ ق - يس : ٤٧

"আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে নিজেই তাদের খাইয়ে দিতেন।"

তাদের যদি হেদায়াতের আলোর সৌভাগ্য হতো তাহলে অবশ্যই তারা বুঝতো যে, ঈমান বিল-কাদর ও তাসলীম বির রেযার অবশ্যই ওই অর্থ নয় যা তারা বুঝে বসেছে। বরং এটা হলো 'আমার উপর যত বিপদ মুসীবতই আসুক আমি এ বিশ্বাসে সবর করে যাবো যে, এসব আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছে। এটা আমার জন্যে অবধারিত ছিলো। এটাকে হাসিমুখে বরদাশত করে যাবো। যেমন কুরআন বলে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط

"বিপদ মুসীবত যা কিছুই মানুষের উপর আপতিত হয় তা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ তার দিলকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।"

–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১১

অতীতের কোনো কোনো আলিমের তাফসির মোতাবিক مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط- এর মধ্যে এমন লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের মধ্যে মুসীবতের সময় এ বিশ্বাস জেগে উঠে যে, এ সকল মুসীবত আল্লাহর তরফ থেকে আসে। তারপর এসব মুসীবতে ভেঙে পড়ার পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে ধৈর্য ও তৃপ্তির বন্যা বয়ে যায়। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط الحديد : ٢٢-٢٣

"যমিনে ও তোমাদের উপর যে বিপদ নাযিল হয় এসবই বাস্তবে ঘটবার আগে একটি কিতাবে লিখা থাকে। নিশ্চয়ই এ কাজ আল্লাহর জন্য অতি সহজ। যাতে করে তুমি কোনো জিনিস হাতে না আসার কারণে আফসোস না করো এবং তার তরফ থেকে কোনো জিনিস পেয়ে সীমার চেয়ে বেশী খুশী না হও।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২২-২৩

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আদম আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আপনি ওই আদম আলাইহিস সালাম যাঁকে আল্লাহ পাক নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকেছেন। ফেরেশতাদেরকে দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। এরপর কেন আপনি আমাদেরকে ও আপনাকে নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন ?"

আদম আলাইহিস সালাম জবাবে বলেন ঃ "আপনি তো ঐ মূসা যাকে আল্লাহ্ পাক নিজের কালাম দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছেন। নিজের পয়গামের বাহক ও মুবাল্লিগ বানিয়েছেন এবং নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আপনার কি জানা নেই যে, এসব কথা আমার ব্যাপারে আমার জন্মের অনেক আগেই লিখা হয়ে গিয়েছে।"

মূসা আলাইহিস সালাম তখন বললেন ঃ "হ্যাঁ এসবই সত্য।"

উভয়ের বিতর্কের এ বিবরণী উল্লেখ করার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ করে এরশাদ করলেন, এ বিতর্কে আদম আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর কথার সমর্থক বানিয়ে ফেলেছিলেন। এখানে দেখার বিষয় যে, আদম

আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের অভিযোগের জবাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তাকদীরের প্রসঙ্গ টেনেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মূর্খ, পাপীরাই তাকদীরকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। এ কাজ কোনো মু'মিন মুসলিমের নয়। আর যদি এটা কারোর গুনাহের ওযর হিসেবে পেশ করা যায় তাহলে প্রত্যেক কাফির আদ ও সামুদের জাতির মত কোনো গুমরাহ ও অভিশপ্ত জাতি, এমনকি ইবলিসও এদিক দিয়ে অপারগ ছিলো বলে বুঝতে হবে যে, তারা যা করেছে আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই করেছে।

এরপর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অভিযোগের ব্যাপারেও লক্ষ্য করুন। তিনি হযরত আদমকে গুনাহ্ সংঘটিত করার কারণে কোনো ভর্ৎসনা করেননি। কেননা তাঁর এ গুনাহ্ আল্লাহর তরফ থেকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর তিনি মাগফিরাত, হেদায়াত ও নবুয়াতের তিনটি গুণে পুরস্কৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বরং তাঁর ভুলের কারণে গোটা বনী আদমের উপর বাহ্যতঃ বিপদ নিপতিত হবার কথার প্রতি হযরত মূসা ইংগিত করেছিলেন। তিনি হযরত আদমকে শুধু একথাই বলেছিলেন যে, "আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করলেন কেন ?" সে কথার জবাবও হযরত আদম আলাইহিস সালাম তা-ই দিয়েছেন যা দেবার মত ছিলো। এ ঘটনা তো আমার জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিলো অর্থাৎ এ ভুল ও ভুলের এ শাস্তি উভয়টাই পূর্বে নির্দিষ্ট ছিলো। যে বিপদ মুসীবত সুনির্দিষ্ট থাকে তা সংঘটিত হলে ধৈর্যধারণ করা জরুরী। কেননা আল্লাহকে 'রব' হিসেবে মানার এটাই মানদণ্ড। এর নামই হলো মানা ও সন্তুষ্ট থাকা। পরিপূর্ণ ঈমানের এটাই হলো দাবী। এ কারণেই কুরআন মজীদে এ জিনিসটি বারবার বলা হয়েছে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ـ المؤمن : ٥٥

"অতএব বিপদ মুসীবতে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চিত থাকো যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিজের গুনাহর ব্যাপারে তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করো।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৫৫

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط ـ ال عمران : ١٢٠

"যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে কাজ করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তাহলে দীনের শত্রুদের কোনো চালই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ○ ال عمران : ١٨٦

"যদি তোমরা সবর করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো তাহলে নিশ্চয়ই এটা হবে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ○ - يوسف : ٩٠

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং সবর করে নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলা মুহ্সিনদের পুরস্কারকে ধ্বংস করেন না।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৯০

মোটকথা বিপদ মুসীবতে সবর করা হলো মু'মিনের কর্তব্য, এর নামই ঈমান-বিল-কাদর। আর মু'মিনের কর্তব্য হলো কোনো পাপ কাজ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তেগফারের অশ্রু দিয়ে নিজেকে পাক পবিত্র করার চেষ্টা করা। এভাবে সে যদি অন্যকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত দেখতে পায় তখন তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জোর চেষ্টা করাও তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যেখানেই কোনো খারাপ কাজ দেখবে তা দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে। অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে। নেক ও ভালো ভালো কাজকে মহব্বতের চোখে দেখবে। এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যাপৃত থাকবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালোবাসবে, তাঁর দুশমনদেরকে দুশমন ভাববে, আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে আবার আল্লাহর জন্যই দুশমনি করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ -

"হে ঈমানদারগণ ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে তোমরা বন্ধু বানিও না। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসার বাণী পাঠাও অথচ তারা তোমাদের নিকট যে হক এসেছে তা অস্বীকার করে বসেছে। রাসূলকে এবং তোমাদের সকলকে তোমাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।"–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ১

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ـ الممتحنة : ٤

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বিদ্যমান। ওই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন সে নিজের জাতিকে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যেসব মাবুদের ইবাদাত করছো তাদের থেকে আমি দায়িত্বমুক্ত ও সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের মতবাদকে অস্বীকার করেছি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ও বিরোধ ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"
—সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৪

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ـ المجادلة : ٢٢

"আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান পোষণকারী কোনো জাতিকে তোমরা কখনো এমন দেখবে না যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবেসেছে, তারা চাই তাদের পিতা হোক কিংবা পুত্র, ভাই হোক অথবা হোক তাদের বংশ পরিবারের লোক। এরা সে লোক যাদের দিলে আল্লাহ তাআলা ঈমানকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা রূহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন।"—সূরা আল মুজাদালা ঃ ২২

এখানে চিন্তার ব্যাপার হলো যদি কুফরী ও নিফাকের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য 'কাযা' ও 'কদর' এর ওযর প্রকৃতই কোনো ওযর হতো, তাহলে তাদেরকে কঠিনভাবে ঘৃণা ও তাদের সাথে স্থায়ী শত্রুতা রাখার হুকুম কেনো দেয়া হলো। ঈমান বিল-কদর এর অর্থ যদি তা-ই হতো যে, যে যতো খারাপ কাজই করুকনা কেনো, যেহেতু তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে তাই তাদের সাথে শত্রুতার চেয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো দরকার, তাহলে আহলে ঈমান ও আহলে কুফর, আহলে তাকওয়া ও

আহলে ফুজুর সকলেই আল্লাহর দরবারে এক সমান হওয়া উচিত ছিলো। অথচ এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, এমন অবস্থা হতেই পারে না।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ـ ص : ٢٨

"আমি কি ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান করবো ? অথবা মুত্তাকীদেরকে করবো বদকারদের সমান ?"—সূরা সাদ ঃ ২৮

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ـ القلم : ٣٥

"আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সমান করে দেবো ?"
—সূরা আল কলম ঃ ৩৫

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ الجاثية : ٢١

"যারা গুনাহ অর্জন করেছে তারা কি একথা মনে করে রেখেছে যে, তাদেরকে লোকদের সমান করা হবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে।"—সূরা আল জাসিয়া ঃ ২১

এভাবে একটি দুটি নয় বরং অসংখ্য আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান আছে, যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহলে মু'মিন ও কাফির, সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থী এবং সঠিকপথের অনুসারী এবং ভ্রান্ত পথের অনুরাগীদের মধ্যে পরিপূর্ণ পার্থক্য করেছেন এবং এ দুটো শ্রেণীর একটিকে অপরটির প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তির দৃষ্টি প্রাকৃতিক বিধান পর্যন্ত পৌছে, অথচ শরীআতের বিধান পর্যন্ত পৌছতে পারে না সে ঐ দুটো শ্রেণীর বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। এ দুটো শ্রেণীকে সে একই সারিতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা মূর্তিকে আল্লাহ তা'আলার সমপর্যায়ের বলে মানে। বস্তুত কিয়ামতের দিন এসব লোকেরা নিজেরাই নিজেদের বোকামীর কারণে আফসোসের সাথে বলবে ঃ

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ شعراء : ٩٨

"আল্লাহর কসম, আমরা মূর্তিদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিজেদেরকে স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছিলাম।"

—সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৯৭-৯৮

শুধু তা-ই নয় বরং এ জাহেলী দর্শন অনেককে জিহালাত ও গুমরাহীর শেষ সীমায় নিয়ে পৌছিয়ে দিয়েছে। এরপর গুমরাহীর আর কোনো সীমা বাকী থাকে না। এসব লোকের অবস্থা হলো, তারা জগতের ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছে এবং প্রত্যেকটি জিনিসকে ওই ধরনের আনুগত্য উপাসনা লাভের অধিকারী মনে করে বসেছে, যা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহরই অধিকার, অন্য কারো নয়। কারণ তারা মনে করে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব ও আল্লাহর সত্তা এ দুটি একই মূলের দুটো পৃথক নাম। তাদের মতে আল্লাহর সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে পৃথক এবং ভিন্ন কোনো জিনিস নয়—নাউযুবিল্লাহ। এবার দেখুন এরূপ চিন্তার পর কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার আর কোনো স্তর বাকী থাকে?

মনে হচ্ছে এ নির্ভেজাল কুফরী মতাদর্শের সমর্থকরা দর্শনগতভাবে এ দুটো অর্থের কোনোটিতেই 'দাস' হবার স্বীকৃতি দেয় না। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি আগেই করেছি। এ দর্শনের ভিত্তিতেই তো তারা তাদের নিজেদেরকে 'আল্লাহ' বলছে। অনেক মুলহিদ (আল্লাহ অস্বীকারকারী) প্রকাশ্যভাবে এ কাজের দাবী করছে। তারা বলছে যে, তারা উপাস্য এবং উপাসক দুটোই। এসব কথাবার্তা দীনের বিধান সম্মত নয়। প্রাকৃতিক বিধান সম্মতও নয়। এটা হলো বরং স্পষ্ট গুমরাহী ও অন্ধ অনুকরণ। নাসারাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধু এ কারণেই কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ তারা একজন মানুষ অর্থাৎ মসিহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান হবার আকীদা পোষণ করতো।

এদের বিপরীত হলো ওদের পথ যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান পোষণকারী। যাদের নিকট আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব আছে। তাদের ধারণা ও বিশ্বাস হলো—"আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর 'রব'। প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা।" এমন সৃষ্টিকর্তা যিনি সমগ্র মাখলুকাত থেকে আলাদা সুস্পষ্ট অস্তিত্বের অধিকারী। তিনি না কোনো জিনিসের ভিতর লীন হয়ে যান, আর না কোনো জিনিসের সাথে যুক্ত হন, আর না তাঁর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির অস্তিত্ব এক। তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর রাসূলদের পূর্ণ অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। সকল

প্রকার নাফরমানী হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি ধ্বংস পসন্দ করেন না। নিজের বান্দাদেরকে কুফর ও শিরক করতে দেখলে তাঁর রাগের সীমা থাকে না। আল্লাহর সৃষ্টিকে প্রতিটি মুহূর্তে তার বন্দিগীতে কাটানো ও তাঁর হুকুম পালনে রত থাকা চাই। এসব কাজ পালনের ব্যাপারে সকলকে আল্লাহর নিকট তাওফিক কামনা করতে হবে। কুরআন মাজীদ শিখাচ্ছে ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - الفاتحة : ٤

"আমরা তোমার দাসত্ব করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"
—সূরা আল ফাতিহা ঃ ৪

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত সকল ফরযের মধ্যে একটি ফরয হলো—তাঁর বান্দারা তাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজের বিরোধিতা করবে, আর আল্লাহর পথে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।

এছাড়া তারা বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় জারী করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করবে। এ পথে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করবে। তাকদীরের উপর নির্ভর করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও সামর্থ কামনা করবে, যেনো বিপদ মুসীবতে আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা দান করেন। বাঁধা বিপত্তি মোকাবিলা করার জন্য তাদের শক্তি দান করেন। এর দৃষ্টান্ত হলো—খাদ্য খাবারের মতো। মানুষ খাবার খায় তার ক্ষুধা দূর করার জন্য এবং দেহকে এমন শক্তি যোগাবার জন্য যা স্বতন্ত্র চাহিদার প্রতিরোধ ও মুকাবিলা করতে পারে। সে তাকদীরের উপর নির্ভর করে। সে কখনো খাবার দাবার ছেড়ে দেয় না। হাদীসে আমরা এ সত্যটা দেখতে পাই। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِي بِهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا ؟

"ওই সব ঔষধপত্র যা দ্বারা আমরা রোগ শোকে চিকিৎসা করি আর ওই তাবিজ তুমার যা আমরা ঝাড় ফুঁক করি, এভাবে সকল সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা ও তদবির যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবলম্বন করি এসব কি তাকদীরকে বদলিয়ে দিতে পারে?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ -

"এসব জিনিসও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।"

এভাবে আর একটি হাদীসে আছে ঃ

اَلدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ لَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

"আসমান ও যমীনে দোয়া ও বালার মধ্যে সাক্ষাত হয়। তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে কে আগে যাবে।

এ হাদীস থেকেও একথার আভাস পাওয়া যায়।

যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহর দাসত্ব করে তাদের ইলেম, আকীদা, চেষ্টা ও আমলের এ হলো পরিচয়। উপরে উল্লেখিত এসব জিনিসই হলো ইবাদাত।

জাবরিয়াদের ভ্রান্তি ও তার প্রতিকার

যেসব লোক প্রাকৃতিক বিধানকে মোশাহিদা করার পর এ মোশাহিদা দ্বারা প্রাকৃতিক ও শরীআতের বিধান ও আহকামের অনুসরণ করা বাধা মনে করেন অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও মোশাহিদাকে শরীআতের অনুসরণ বাদ পড়ে যাবার কারণ বলে মনে করে তারা বিভ্রান্তির বিভিন্ন স্তরে নিমজ্জিত।

এক ঃ যারা বেশী বাড়াবাড়ী করার মত লোক তারা তো এটাকে সাধারণ নীতি বলে মনে করে। শরীআত বিরোধী যেসব কাজ করে, এসব কাজকে তারা তাকদীরের উপর ছেড়ে দেয়। এদের এ নীতি ইহুদী-নাসারাদের বিভ্রান্তিমূলক নীতির চেয়েও বেশী খারাপ। এদের কথাবার্তা সেইসব মুশরিকদের কথাবার্তার মতো যারা বলে ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ - الانعام : ١٤٨

"যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করতে পারতাম না এবং কোনো জিনিসকে তার হুকুমের খিলাপ হারাম বলে নির্দিষ্ট করতাম না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪৮

বিশ্বের বুকে এদের মতো বিপরীতমুখী আচরণকারী আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। যারা তাকদীরকে দোষ দিয়ে তদবীর থেকে বিরত

থাকে, তারা বিপরীত পথেই চলে থাকে। কেননা তারা মানুষের ভালো মন্দ সকল ধরনের আমলের একই পরিণতি হবে, এটা মনে করে না। তাছাড়া সব ধরনের কাজকে এক সমান পসন্দের দৃষ্টিতে দেখাও তাদের জন্য সম্ভব নয়। বরং তারা যদি কেউ যুলুম করে অথবা কোনো যালিম ব্যক্তি সাধারণ লোকদেরকে কষ্ট দেয়, অথবা কোনো মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে ও মানুষের রক্ত ঝরায়, তাদের মান-ইজ্জত নষ্ট করে, এবং এভাবে অন্যান্য বিপজ্জনক ও হায়েনার মতো আচার-আচরণের কাজ করতে শুরু করে তাহলে এরা এসব যুলুমমূলক কাজের বিরোধিতার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তারা এ যালিম ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। এ শাস্তি অন্যান্য যালিমদের জন্যও শিক্ষামূলক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এসব ঘটনার সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয়, তাকদীর যদি ওযরই হয় তাহলে তোমরা কেনো কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট ও খারাপ কাজের ব্যাপারে অস্থির, অতিষ্ট হয়ে উঠো ? প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যা সে করতে চায়, করতে দাও। কারণ যা সে করে তাকদীর অনুযায়ীই তো করে। যদি কাযা ও কদরকে এখানে তোমরা ওযর হিসেবে না মানো, তাহলে নিজের মূল দাবীকেই বাতিল হিসেবে মেনে নাও।

আসলে এ লোকেরা বাস্তব ক্ষেত্রে এ নীতির অনুসরণকারী মোটেই নয়। তারা নিজেদের কথায় অটল থাকে না। তাদের দৃষ্টি সবসময়ই তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। যেখানেই তাদের স্বার্থ আদায় হয় সেখানেই তারা এ নীতিকে মেনে নেয়। আর যেখানে অবস্থা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায় সেখানেই তারা এ নীতিমালাকে এড়িয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্যেই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি কত সঠিক কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আনুগত্যের ব্যাপারে তোমরা কদরী হও আর পাপের সময় হও জবরী। যে সময় যে মত তোমাদের স্বার্থ পূরণ করে সে সময় তোমরা সে মত গ্রহণ করো।"

দুই ঃ দ্বিতীয় প্রকার লোক তারা—যারা এ নীতিমালাকে সাধারণ নীতিমালা বলে মনে করে না, তারা এর ব্যবহারকে 'সাধারণ ও বিশেষ' এ দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। তারা তাদের এ জ্ঞান গবেষণার জন্যে গর্ব অনুভব করেন। তাদের ধারণা, যেসব লোক শরীআতের আহকামের বাধ্যবাধকতায় আছে এবং যারা নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে এ অনুভূতি রাখে যে, তা তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অধীনে সংঘটিত হয়। কিন্তু ওইসব লোক শরীআত মেনে চলে না যারা মনে করে যে, সকল কাজকর্ম আল্লাহরই সৃষ্টি। তাতে তার নিজের কোনো অংশ বা দায়-দায়িত্ব নেই। বরং তাকে

তা করতে বাধ্য হতে হয়। এবং আল্লাহ তাদের মধ্যে অর্থাৎ তাদের অবস্থা ও কাজকর্ম ঠিক সেভাবে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করেন, যেমন প্রতিটি গতিমান বস্তুকে গতিদান করে থাকেন। মোটকথা, তাদের কথা হলো, ওইসব লোকের শরীআত মেনে চলার প্রয়োজন নেই—যারা আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে, তাদের কারো কারো ধারণা যে, হযরত খিযির এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী এ ধরনের লোকদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় যে, তারা সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। সাধারণ লোকদেরকে তো শরীআত মানতে বাধ্য মনে করে। কিন্তু বিশেষ লোকেরা বাধ্য নয়। তারপর তারা সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মতই সংজ্ঞা বর্ণনা করে থাকে।

কখনো বলা হয়ে থাকে যেসব লোক প্রাকৃতিক বিধান উপলব্ধি করে এবং এ দর্শন পোষণ করে যে, মানুষের সকল কাজকর্মের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। গোটা বিশ্ব তাঁরই ইচ্ছার অনুসারী, তাদেরকে শরীআত মেনে চলতে হবে না।

আবার কখনো কখনো বলে থাকে যে, যারা সত্যকে শুধু জানে কিন্তু প্রত্যক্ষ করে না এবং প্রত্যক্ষ করা ছাড়াই ঈমান পোষণ করে, তারাই শুধু শরীআতের আহকাম পালন করতে বাধ্য। তারা শরীআতের হুকুম না মেনে চলতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করে ও একে প্রত্যক্ষ করে সে দীনের আহকাম মানতে বাধ্য নয়।

এর স্পষ্ট অর্থ হলো, এসব লোক আল্লাহর ইচ্ছার বাধ্যবাধকতা এবং তাকদীরের ফায়সালাকে শরীআতের বিধান মেনে চলার প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এ ধারণা এবং এ বিপজ্জনক গুমরাহীতে এমন সব লোক ফেঁসে আছে যাদেরকে জ্ঞান-গবেষণা ও মারেফাতের দিকপাল এবং তাওহীদের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের এ ভুল চিন্তার কারণ তারা বুঝতেই পারছে না যে, বান্দাহকে এমন কাজেরও নির্দেশ দেয়া যেতে পারে যে কাজের বিরোধিতা করা তার ভাগ্যে আগ থেকেই লিখা হয়ে গেছে। মুতাযিলা ছাড়াও অন্যান্য কাদরিয়ারাও তাদের মতো এ সত্যকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুতাযিলারা শরীআতের বিধান মেনে চলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী বলে মনে করে। এবং তাদের মধ্যে কেউ শরীআত মেনে চলা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিটি জিনিসকে বেষ্টন

করে আছে এবং বান্দার আমল আল্লাহর সৃষ্ট তা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত একথা তারা অস্বীকার করে। এদের মুকাবিলায় এসব লোকের অবস্থা হলো তারা কাযা ও কদরকে তো (তাকদীর) স্বীকার করে। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য শরীআত মেনে চলা জরুরী বলে তারা স্বীকার করে না এবং যারা তাকদীরকে মোশাহিদা করেছে তারা শরীআত মেনে চলা হতে মুক্ত।

এসব লোকদের মতে শরীআতের আহকাম মেনে চলা শুধু ওই সব লোকদের জন্য দরকার যারা প্রাকৃতিক বিধানের তাৎপর্য বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। আর যারা এ স্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে তাদেরকে এরা শরীআতের আহকাম মেনে চলার উর্ধে এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ দলের মধ্যে গণ্য করে। তাদের একথার স্বপক্ষে তারা কুরআনে কারীমের এ আয়াতে কারীমা পেশ করেন।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ الحجر : ٩٩

"নিজের 'রবের' বন্দেগী করো ইয়াকীন আসা পর্যন্ত।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৯৯

এ আয়াতের তারা মনগড়া ব্যাখ্যা করে বলেন 'ইয়াকীন' অর্থই হলো আল্লাহর ইচ্ছার জ্ঞান ও মোশাহিদা। কিন্তু এটা সরাসরি কুফরী বক্তব্য। ইসলামী নীতিমালার প্রতি সচেতনভাবে দৃষ্টি দিলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একথা ধরা পড়ে যে, বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শরীআতের অনুসরণ করতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এ থেকে কোনো ব্যক্তি কখনো এবং কোনো অবস্থাতেই বাদ ও মুক্ত হতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দীনের এ সুস্পষ্ট নীতমালাকে জানে না, তাকে জানাতে হবে এবং বিস্তারিতভাবে তাকে বুঝাতে হবে। এভাবে বুঝিয়ে দেবার পরও যদি সে শরীআত অনুসরণ করে চলা দরকার নেই বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি হত্যাযোগ্য।

এ ধরনের নাস্তিক্যবাদী কথা ও বিশ্বাসের অস্তিত্ব ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দিগুলোতে বিদ্যমান ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ধরনের কথার বেশ প্রচলন হয়েছে, যেসব কথা আল্লাহ ও আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও শত্রুতার শামিল। এসব কথা নবীগণকেও মিথ্যাবাদী বলার শামিল। এসব আকীদা পোষণকারীরা যদি এসবের বাতিল হবার ব্যাপারে অবগত না থাকে এবং একথা মনে করে যে, আল্লাহর রাসূল ও অলি-আল্লাহদের মতো এই-ই ছিলো তাহলে তাদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যে বিশ্বাস পোষণ করে যে, নামায তার উপর ফরয নয়। কারণ তার মধ্যে এমন

রূহানী কামালিয়াত ও মনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যা থাকলে নামায পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। অথবা তার জন্য মদ এ কারণে হারাম নয়, কারণ তিনি ওই সব আল্লাহর খাস বান্দাদের মধ্যে গণ্য, শরাব পান করলে যাদের কোনো রূহানী ক্ষতি হয় না। অথবা খারাপ কাজ করা তার পক্ষে এজন্য জায়েয যে, সে সমুদ্রের মতো এতো বিরাট বিশাল বিস্তৃত যে, গুনাহর মতো কাজ তার গায়ে কোনো কাদা লাগাতে পারে না।

এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে, এসব মুশরিক যারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ্ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম মুতাবিক চলা অপরিহার্য তা মানে না, চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের দু'টি মৌলিক ভুল আছে।

প্রথমটি হলো বিদআত, আর দ্বিতীয়টি হলো তাকদীর সম্পর্কে ভ্রান্ত যুক্তির আশ্রয় নেয়া। তারা এসব বিদআতকে (অর্থাৎ স্বরচিত আদর্শকে) নিজেদের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করে যা শরীআতে ইলাহীর সরাসরি খিলাফ। আবার কখনো কখনো আহ্কামে ইলাহির পাবন্দীর বিরুদ্ধে তাকদীর সংক্রান্ত ভ্রান্ত যুক্তি খাড়া করে।

মুশরিকদের এ চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে কোনো না কোনো প্রকারে বিদ্যমান। চাই তা শরীআতের খিলাফ বিদআতের অনুসারী হোক, কিংবা হোক তাকদীর থেকে যুক্তি গ্রহণ করা। সর্বাবস্থায় এ দুটো দলই গুমরাহীর মধ্যে শামিল। সকল অবস্থায়ই মুশরিকদের সাথে তাদের আকীদাগত মিল একেবারেই স্পষ্ট। উপরে উল্লেখিত মুশরিকদের দুটি বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাকদীরের যুক্তির পক্ষে তাদের গ্রহণ করা কিছু কুরআনের আয়াত উপরে আলোচিত হয়েছে। তাই সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখানে দেয়া প্রয়োজন মনে করি না। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাদের বিদআতী কাজ ও শরীআত বানানো কাজ, এসবের আলোচনা এবং খণ্ডন কুরআন মাজীদে অন্যান্য জায়গাসহ সূরা আল আন'আম ও সূরা আল আরাফে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ

حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ

"তারা বলে এসব জন্তু জানোয়ার ও এসব ক্ষেত খামার সুরক্ষিত। এসব শুধু তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমি খাওয়াতে চাইবো। আসলে এসব বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু

জন্তু জানোয়ার এমন আছে যেগুলোর উপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে, আর জন্তুর যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। এসব কিছুই তারা আল্লাহকে মিথ্যা বানাবার জন্য বলছে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৮

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ ـ الاعراف : ٢٧

"হে বনী আদম! শয়তান তোমাদেরকে যেনো তার ফেতনায় ফেলতে না পারে। যেমন তোমাদের মাতা-পিতা (আদম হাওয়া)-কে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৭

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ـ الاعراف : ٢٨

"এবং তারা (মুশরিক) যখন কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এসব কাজে লিপ্ত দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ আমাদেরকে এসব কাজের হুকুম দিয়েছেন। হে নবী! তুমি বলো, আল্লাহ অশ্লীল কাজের হুকুম দেন না।"

আরো বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ الاعراف : ٢٩

"তাদেরকে বলো আমার 'রব' তো ন্যায় ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। আরো হুকুম দিয়েছেন একথার যে, তোমরা প্রতিটি সাজদা বা ইবাদাত আদায় করার সময় তোমাদের লক্ষ্য ঠিক রাখবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৯

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"(হে নবী!) তাদের বলো, আল্লাহর সৃষ্টি ওই সব রূপসৌন্দর্য যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য পয়দা করেছেন এবং পবিত্র জীবিকা-সমূহ কে হারাম করে দিয়েছেন ?"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩২

আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ اعراف : ٣٣

"(হে মুহাম্মাদ!) তাদের বলো, আমার রব সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ হারাম করে দিয়েছেন। তিনি আরো হারাম করে দিয়েছেন গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজ। হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি। আল্লাহর নামে এমন কথা বলাও হারাম করেছেন যে কথার ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।"
—সূরা আল আরাফ ঃ ৩৩

দুঃখের বিষয় এরপরও এরা তাদের মনগড়া বিদআতকে প্রকৃত সত্য বলে মনে করছে। আর এ সত্য পর্যন্ত পৌঁছার পথ তাদের নিকট ওই পদ্ধতি যার পরিচালক পথপ্রদর্শকরা শরীআতের বিধি-বিধানের অনুসারী নয়। বরং এসব ব্যাপারে অনুসরণ যা হয় তা শুধু মুশাহিদা।

'কদর'কে শরীআত না মানার যুক্তি হিসেবে পেশ করা প্রকৃতপক্ষে একটি ভাওতাবাজি। এসব যুক্তি শুধু প্রতিপক্ষকে লা জবাব করে দেবার জন্য তারা ব্যবহার করে থাকে। নতুবা প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব ব্যাপারে তাদের ঝোকপ্রবণতা তাদের প্রবৃত্তির পূজা বই আর কিছু নয়। প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই প্রকৃতপক্ষে তাদের দীনের মূল ভিত্তি। এ ব্যাপারে তারা ওই বিদআত পূজারী 'জাহমিয়া' ইত্যাদি কালাম শাস্ত্রবিদদের থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। যারা তাদের মনগড়া এবং কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী কথাবার্তাকে 'ইলমের মূল হাকীকত' বলে মনে করে। এদের এসব কথাবার্তার উপর ঈমান ও ইতেকাদ রাখা তাদের নিকট শরীআত দ্বারা প্রমাণিত সিদ্ধান্তসমূহ হতেও বেশী জরুরী। এজন্য তারা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করে দেয়। অথবা স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে একে এড়িয়ে চলতে থাকে। না এটা তারা বুঝে, আর না এ ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। বরং তারা বলে যে, আমরা তার ক্ষমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না। তাই এসব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। অথচ কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তাদের এসব আকীদা-বিশ্বাসের উপর তারা দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। এদিকে একজন মোটা বুদ্ধির মানুষও এসব শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, এসব ইসলামের নীতিমালার একেবারেই বিপরীত। কিন্তু এভাবে তারা কুরআন ও সুন্নাতের

সিদ্ধান্তসমূহকে আল্লাহর জ্ঞানের হাওলা করে সকল শর্ত হতে মুক্ত হয়ে যাবার কৌশল অবলম্বন করে। এদিকে এদের নামমাত্র "জ্ঞানের উৎস" —এর যুক্তিবত্তার অবস্থা হলো, যদি এটাকে সঠিক জ্ঞান ও যুক্তিবৃত্তির আলোকে দেখা যায় তাহলে তার সবটাই অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার বলেই অনুভূত হবে। অবিকল অবস্থা এসব সালেকীনের (অগ্রবর্তীদের) ব্যাপারেও এদের শরীআত বিরোধী কথাবার্তা ধ্যান-ধারণাকে যদি যাচাই বাছাই করা যায় যাকে তারা অলি-আল্লাহদের হাকীকত বলে মনে করে তাহলে এসবই তাদের নিজেদের মনগড়া কথা এবং প্রকৃতির তাড়না বলেই প্রমাণিত হবে। এসব মেনে চলা আল্লাহদ্রোহী ও তার শত্রুদেরই কাজ। বন্ধুদের নয়।

এসব লোক সত্যের রাজপথ থেকে কেনো বিভ্রান্ত হলো ? একথাও এখানে বুঝে নিতে হবে। তাদের সত্যপথ থেকে সরে যাবার কারণ শুধু একটা, আর তাহলো তারা আল্লাহর নাযিল করা আয়াতের উপর নিজেদের ধারণা বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছে আর আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দিয়ে প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর অনুসারী হয়ে পড়েছে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইচ্ছা আগ্রহ তার নিজের বিশেষ স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। স্নেহ ভালোবাসার ছোঁয়া থেকে কোনো হৃদয় খালি থাকে না। এ এক অতি সত্য কথা। এভাবে এটাও সত্য কথা যে, যে ভাবের ও যে ধরনেরই কোনো লোকের মনে স্নেহ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকবে, সে অনুযায়ীই তার রুচিপ্রবৃত্তিও তার মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন একজন মু'মিনের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের রুচি প্রকৃতি পাওয়া যায় যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না। একথার চিত্র একটি সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ - مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ -

"যে ব্যক্তির হৃদয়ে তিনটি জিনিস মওজুদ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে ঃ এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশী প্রিয় হবেন। দুই. যাকে সে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। তিন. কুফরী হতে বের হয়ে আসার পর আবার সে দিকে ফিরে যাওয়াকে সে এমন ভাবে অপসন্দ করবে যেমন তাকে আগুনে ফেলে দেয়াকে সে অপসন্দ করে।"

এ ধরনের আর একটি হাদীসও আছে ঃ

ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا ـ

"ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই আস্বাদন করেছে যে আল্লাহকে 'রব' 'ইসলামকে' দীন এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে।"

ঠিক এভাবে কাফির, বেদআতী ও নফ্স পূজারীদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা আগ্রহ ও চাহিদা মোতাবিক একটি বিশেষ ঝোঁক প্রবণতা পাওয়া যায়। সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'এটা কেমন কথা যে, যাদের দীন ও ঈমান শুধু তাদের নফ্সের খাহেশ মুতাবিক হয়, তারাও তাদের এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তাকে খুব বেশী ভালোবাসে ?' তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের কি আল্লাহ তা'আলার এ কথা স্মরণ নেই যে, তিনি বলেছেন ঃ

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط ـ البقرة : ٩٣

"তাদের কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে গোবাছুরের ভালোবাসা দৃঢ়ভাবে বসে গিয়েছিলো।"-সূরা আল বাকারা ঃ ৯৩

মূর্তিপূজারীদেরও এ একই অবস্থা। তাদের মনেও দেব-দেবীর গভীর ভালোবাসা ও আস্থা পাওয়া যায়। কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط ـ البقرة : ١٦٥

"(আল্লাহর একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর শক্তিকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ ও সমতুল্য মনে করে এবং তাদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমনভাবে ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা সর্বাধিক ভালোবাসে আল্লাহকে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ

هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط ـ القصص : ٥٠

"এখন তারা যদি তোমার এ দাবী মেনে না নেয় তাহলে বুঝে নিবে, এরা আসলে নিজেদের কামনা বাসনারই অনুগামী। আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর হেদায়াত বাদ দিয়ে শুধু নিজের কামনা বাসনার অনুগমন করে।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫০

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى

"এরা শুধু তাদের ধারণা ও নফসের খাহেশ পূরণের তাড়নায় ব্যস্ত। অথচ তাদের নিকট তাদের 'রবে'র তরফ থেকে হেদায়াত এসে পৌঁছেছে।"–সূরা আন নাজম ঃ ২৩

তাই বুঝা গেলো প্রত্যেক ব্যক্তির ঝোঁক প্রবণতা ও স্বভাব প্রকৃতি তার বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী গড়ে উঠে। আর শুধু ঝোঁক প্রবণতা দ্বারা প্রকৃত সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করার অধিকার দেয়া যায় না। কিন্তু এ নামসর্বস্ব পথের দিশারী আলেমদের অবস্থা হলো এই, যাদের দলিল প্রমাণ পেশ করার ধরন সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছি। এদের আকীদা ও আমলের 'কেবলানামা' স্বয়ং তাদের রুচি ও প্রবৃত্তির আকর্ষণ বই আর কিছু নয়। এ কারণেই এরা সাধারণত রাগ-অনুরাগ ও বাদ্য-বাজনার পাগল হয়ে থাকে। তাদের মতে বাদ্য-বাজনা, রাগ-অনুরাগ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। এর দ্বারা স্বাভাবিক ভালোবাসার জযবা মনে উপচে উঠে। আর এ স্বাভাবিক প্রেমপ্রীতি শুধু ঈমানদারদের মধ্যে পাওয়া যায় না বরং আল্লাহ পূজারী, মূর্তি পূজারী, নফস পূজারী, দেশ পূজারী, জাতি পূজারী, নারী পূজারী, রাজা বাদশাহ পূজারী সহ সকলেই সমানভাবে এর মধ্যে শরীকদার। কারণ কোনো মনই ভালোবাসা হতে খালি নয়। এজন্য যার হৃদয়ে যে অনুরাগ থাকবে—গানের লহরী, বাদ্যের উতালতা ও সুরের মূর্চ্ছনা তার সেই অগ্নিশিখাকে তেজোদীপ্ত করে তুলবে। একথা প্রকৃতপক্ষে মোটেই সত্য নয় যে, গান ও সুরের লহরী শুধু ঈমানদারদেরকে আলোড়িত করে এবং অন্যান্য বস্তুর ভালোবাসাকে জাগিয়ে দেয় না।

এসব লোক নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিরুচির প্রতি এত আসক্ত ও বিশ্বস্ত যে, এর তুলনায় কুরআন ও সুন্নাতের হিদায়াতের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। অথচ আল্লাহ যে তাঁর ইবাদাতের তাবলীগের জন্যই দুনিয়াতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যের তালকীন দেয়াই যে আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়ায় প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য তার বিপরীত

পথে দীনে হকের পায়রুবী করা যায় না সে কথা খুবই স্পষ্ট। সেটা তো মূলত শুধু নিজের নফ্সের খাহেশেরই পায়রুবী হতে পারে।

তিন ঃ তৃতীয় শ্রেণীর লোক তারা, যারা এ দলের সবচেয়ে বেশী ইয্যত ও মর্যাদার অধিকারী। এসব লোক দীনের সাধারণ ফরয কাজ গুলো পালন করেন ও হারাম কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে পুরোপুরি-ভাবে আল্লাহর হুকুম মানেন। কিন্তু তাদের ভ্রান্তি হলো, কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত জগতে বসবাস করেও তার প্রতি কোনো লক্ষ্য আরোপ করেন না। বরং এড়িয়ে চলেন। অথচ এসব কার্যকারণও প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের শামিল। তাদের এ কর্মপদ্ধতি বা আমলের ভিত্তি হলো তাদের এ ধারণা যে, যখন কোনো আরেফ কামেল তাকদীর সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হয়ে যান, তখন তিনি আর এর মুখাপেক্ষী থাকেন না। তারপক্ষে আর কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়োজন হয় না। এমন কি তাঁদের মধ্যে তো কেউ কেউ পরিষ্কারভাবে বলে যে, 'তাওয়াক্কুল' (অর্থাৎ কোনো কাজে নিজের সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর পরিণাম পরিণতি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়া) এবং দোয়া ও এ ধরনের অপরাপর ঈমানী গুণাগুণ আল্লাহর খাস বান্দাদের জন্য নয়। বরং এসব হলো সাধারণ মানুষের মান। কারণ, যে ব্যক্তি তাঁর নিজের চোখে তাকদীর অবলোকন করে ফেলেছে সে তো জেনেই গেছে যে, অমুক জিনিস 'তাকদীর লিপিতে' লেখা হয়ে গেছে। এবং তা অমুক সময়ে প্রকাশ হয়েই পড়বে। অতপর তার পক্ষে আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবার কি প্রয়োজন বাকী থাকে ? স্মরণ রাখতে হবে, এটাও একটি বিরাট বিভ্রান্তি। কারণ আল্লাহ পাক বস্তুকে তার কার্যকারণের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই পরিণতিকে তার কার্যকারণ থেকে পৃথক করা যায় না। যেমন সায়াদাত (সৌভাগ্য) ও শাকাওয়াত (দুর্ভাগ্য)-কে কার্যকারণের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلاً خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَيَعْمَلُ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ وَخَلَقَ لِجَهَنَّمَ اَهْلاً خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَيَعْمَلُ اَهْلَ جَهَنَّمَ يَعْمَلُوْنَ ـ احمد، مسلم، ابو داؤد

"কিছু লোককে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের পিতার ঔরষে থাকাকালীনই তাদের জন্য এ জান্নাত তৈরি করে রাখা হয়েছে। আর তারাও জান্নাতবাসীদের মতই আমল করে থাকে।

এভাবে কিছু লোককে আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ঔরষে থাকা অবস্থায়ই তাদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তারাও জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো আমল করে থাকে।"-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

অন্য আর একটি হাদীসে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে জানালেন যে—

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْمَقَادِيْرَ ـ

"আল্লাহ্ প্রত্যেকের তাকদীর লিখে রেখেছেন; তখন তাঁরা আরজ করলেন।"

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَدْعُ الْعَمَلَ وَنَتَّكِلُ عَلَى الْكُتُبِ ـ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমল করা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর বিধিলিপির উপর ভরসা করব?"

তখন রাসূল (স) উত্তরে বললেন ঃ

لَا اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ـ اَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلُ السَّعَادَةِ فَسَيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ـ بخارى و مسلم

"না এমন করো না। বরং আমল করো। কেননা যে কাজ তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে সে কাজ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। নেক ব্যক্তির জন্য নেক কাজের ও বদ লোকের জন্য বদ কাজের পথ সুগম করে দেয়া হয়।"-বুখারী ও মুসলিম

এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কার্যকারণ ও উপায় অবলম্বন করার জন্য তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তা স্বয়ং ইবাদাতের মর্যাদা রাখে। আর তাওয়াক্কুলের যে সম্পর্ক, তার উৎসতো ইবাদাতের সাথে পুরোপুরিভাবেই সম্পর্কিত। নীচে দেয়া কুরআনের আয়াতের শব্দসমূহ ও বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করুন।

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط ـ هود : ١٢٣

"অতএব তাঁর ইবাদাত করো এবং তার উপর ভরসা করো।"
—সূরা হূদ ঃ ১২৩

قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○ رعد : ٣٠

"বলুন তিনি আমার রব। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি। তাঁর নিকটেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৩০

হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম বলেছেন ঃ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ – هود : ٨٨

"তাঁর উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাবো।"–সূরা হুদ ঃ ৮৮

চার ঃ চতুর্থ প্রকার লোক হলো তারা, যারা দীনের ফরয বিধানসমূহ মেনে চলে। কিন্তু মুস্তাহাব ও নফল কাজের প্রতি যত্নশীল হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওই হিসেবে তাদের মর্যাদা, ত্রুটি ও কমতি এসে যায়।

পাঁচ ঃ পঞ্চম হলো ওরা, যারা কাশ্‌ফ ও কারামতের বাতেনী শক্তি অর্জন করার নামে আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার হয়। ইবাদাত বন্দেগী করা হতে তারা বেপরওয়া হয়ে যায়। আল্লাহর শোকর আদায় করারও প্রয়োজন মনে করে না।

উপরে আলোচিত এসব গোমরাহী এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সুলুকপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। এসব ত্রুটি থেকে আত্মরক্ষার পথ একটাই। আর সে পথ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব কাজ সহকারে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে সেসব কাজ খুবই পাবন্দীর সাথে আদায় করতে থাকা।

ইমাম যুহরী এ সত্যের দিকেই ইংগিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের অতীতের বুযুর্গগণ বলতেন, মযবুত করে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই নাজাত নিহিত। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটা মহাসত্য যার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। ইমাম মালিক (র)-এর মতে সুন্নাতের দৃষ্টান্ত হলো—হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মতো। যে ব্যক্তি এ কিস্তিতে উঠে বসতে পেরেছেন তিনিই মুক্তি পেয়েছেন। আর যে ব্যক্তি এ কিস্তি হতে দূরে থেকেছে সে নির্ঘাত পানিতে ডুবে মরেছে।

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহার করা—'ইবাদাত' 'এতায়াত' 'ইসতেকামাত' 'লুযুমে সিরাতে মুসতাকীম' ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থের

মধ্যে পার্থক্য খুব কমই। পার্থক্য শুধু নামে এবং ব্যাখ্যায়। এসব নাম ও অর্থের বাস্তব অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে দুটো জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ মানুষ একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগী করবে। আর দ্বিতীয় হলো, এ বন্দেগী শুধু আল্লাহর নাযিল করা ও বলে দেয়া পদ্ধতিতেই করতে হবে। নিজের মনগড়া কোনো পথে ও পদ্ধতিতে নয়। কুরআনের এসব আয়াতেও হেদায়াতের পথ সুস্পষ্ট ঃ

(١) فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ الكهف : ١١٠

(১) "অতএব যে তার রবের সামনে হাজির হবার আশা রাখে ; সে যেন নেক আমেল করে। আর তাঁর বন্দেগীতে কাউকে শরীক না করে।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ১১০

(٢) بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص

(২) "(বস্তুত তোমাদের বা অন্য কারো বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।) বরং সত্য কথা হলো এই যে, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করে দেবে এবং কার্যত সত্য-নিষ্ঠা অবলম্বন করবে, তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১২

(٣) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ـ النساء : ١٢٥

(৩) "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবন চলার পথ সততা সহকারে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করে, সেই ইবরাহীমের পথ থেকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— তার চেয়ে উত্তম জীবন যাপনের পথ আর কার হতে পারে ?"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৫

এ তিনটি আয়াতকে একটির আলোকে অপরটিকে দেখলে বুঝা যাবে যে, প্রথম আয়াতে যে জিনিসকে 'আমলে সালেহ' বলা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে সে জিনিসকে 'ইহ্সান' বলা হয়েছে। এর অর্থ আমলে

সালেহ্-এর অপর নামই হলো 'ইহ্সান।' ইহ্সানের অর্থ হলো 'হাসানাত' পালন করে চলা। আর 'হাসানাত' ওই সব জিনিসকে বলা হয় যেসব জিনিস আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পসন্দ করেন। ওই সব জিনিস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পসন্দনীয়, যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। অতএব ওই সব 'বিদআত' দীনের মধ্যে যার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ নেই সেসব বিদআত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট গ্রহণীয় হতে পারে না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট যেসব কাজ গ্রহণীয় ও পসন্দীয় নয় সেসব কাজ হাসানাত ও আমলে সালেহ্ বলে গণ্য হতে পারে না। এসব কাজ ফিসক-ফুজুরি হিসেবেই স্পষ্টভাবে পরিচিত।

أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ এবং وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

কুরআনের আয়াতে এ দুটি অংশে দীনের ইখলাসের ব্যাপারে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী হতে হবে একাগ্র, নিখুঁত এবং নির্ভেজাল। এ সময়ে আল্লাহর চিন্তা ছাড়া আর কারো চিন্তা বিন্দুমাত্রও মনে জাগবে না।

হযরত ওমর (রা) এভাবে দোয়া করতেন ঃ "হে আমার আল্লাহ! আমার প্রত্যেকটি কাজ সৎ ও সঠিক এবং তোমারই জন্য করে দাও। এতে আর কাউকে অংশ দিও না।" ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, আহসান শব্দের অর্থ হলো আখলাসু ও আসওয়াবু অর্থাৎ খালিস, সঠিকভাবে ও একান্তভাবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, আখলাসু ও আসওয়াবু এর অর্থ কি ? উত্তরে তিনি বললেন, আমল যদি একনিষ্ঠ হয়, কিন্তু সঠিক না হয় তাহলে তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়। এভাবে আমল যদি সঠিক হয়, কিন্তু একনিষ্ঠ না হয় তাহলেও গ্রহণীয় নয়। আল্লাহর দরবারে ওই আমলই গ্রহণযোগ্য যা খালিসও আবার সঠিকও। খালিসের অর্থই আল্লাহর জন্য নিবেদিত, একনিষ্ঠ। আর সঠিক হবার অর্থ হলো, সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী হওয়া।

একটি অভিযোগ ও তার জবাব

এখানে অভিযোগ করা যেতে পারে, যদি আল্লাহর পসন্দনীয় আমল ও গুণাবলী ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হয়, তবে কেনো কুরআন মাজীদে

'ইবাদাত' শব্দটির প্রতি অন্যান্য নেক আমল অথবা ভালো গুণাবলীকে আত্ফ করা হয়েছে ? আত্ফ তো হলো একথার দলিল যে, মাতুফ ও মাতুফে আলাইহে দুটি পৃথক জিনিস। এক জিনিস নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ الفاتحة : ٤

"হে প্রভু ! আমরা তোমারই ইবাদাত করছি। আর তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি।"—সূরা আল ফাতিহা ঃ ৪

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ـ هود : ١٢٣

"অতএব তাঁরই ইবাদাত করো এবং তাঁর উপরে ভরসা করো।"

—সূরা হুদ ঃ ১২৩

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ـ نوح : ٣

"আল্লাহর বন্দেগী করো এবং ভয় তাঁকেই করো। আর আমার কথা মেনে চলো।"—সূরা নূহ ঃ ৩

প্রথম আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটির প্রতি "ইস্তেয়ানাত" (সাহায্য কামনা করা) শব্দটিকে, দ্বিতীয় আয়াতে "তাওয়াক্কুল" ও তৃতীয় আয়াতে "তাকওয়া" ও "এতায়াতে রাসূলকে" আত্ফ করা হয়েছে। এটা একথারই প্রমাণ যে, এসব জিনিস ইবাদাতের অংশ নয় বরং এর থেকে পৃথক নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখে।

এসব অভিযোগ ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। একটি শব্দকে আর একটি শব্দের উপর "এবং" দ্বারা নির্দেশ করলে দুটি ভিন্ন জিনিস হয়ে যায়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। স্বয়ং কুরআনে কারীমে এমন অনেক বাক্য আছে যা এ অভিযোগ ভুল বলে প্রমাণ করে। যেমন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ العنكبوت : ٤٥

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

—সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫

এ বাক্যটিতে 'ফাহশা' অশ্লীলতা শব্দের প্রতি 'মুনকার' শব্দটিকে 'এবং' দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অথচ 'মুনকারের' মধ্যে ফাহশার অর্থ নিহিত এবং ফাহশা মুনকারের একটি অংশ বই কিছুই নয়। নিম্নের আয়াতটিও এ ধরণের ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى - النحل : ٩٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার ও ইহসান অনুগ্রহ এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করার নির্দেশ দেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯০

এ বাক্যটিতেও 'ইতায়িজিল কুরবা' (আত্মীয় স্বজন) শব্দটিকে 'আদল' ও ইহসান' শব্দের প্রতি সংযুক্ত করা হয়েছে অথচ আত্মীয় স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করা আদল ও ইহসানেরই একটি রূপ।

এর আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط - الاعراف : ١٧٠

"যারা আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে ধারণ করে ও নামায় কায়েম করে।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৭০

এখানে 'ইকামাতে সালাত' শব্দকে 'তামাস্‌সুক বিল কিতাবে'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অথচ ইকামাতে সালাত 'তামাসসুক বিল কিতাবের'ই একটি রূপ শুধু নয় বরং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

এসব দলিল প্রমাণ দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'আত্‌ফ' সবসময় ভিন্নধর্মী কাজ বুঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয় না বরং অন্য উদ্দেশ্য বুঝাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোনো সময় একটি শব্দের অর্থ অন্য আর একটি শব্দের অর্থের অংশ হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু এরপরও ঐ শব্দের উপর এ শব্দটিকে 'আত্‌ফ' করে দেয়া হয়। আর এ 'আত্‌ফের' বা সংযুক্ত করা বাক্যের উদ্দেশ্য হলো যে, এভাবে এর উল্লেখের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়ে যায়। এভাবে কখনো কখনো একটি শব্দ বিভিন্ন জায়গায় ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদি তা একা নেয়া হতো তাহলে এর অর্থে স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ হতো। আর যদি অন্য কোনো শব্দের সাথে মিলিয়ে নেয়া হতো তাহলে তার বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অর্থ হয়ে যেতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনের এ আয়াতে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - البقرة : ٢٧٣

সূরা বাকারার এ আয়াতে 'ফকির' শব্দটিকে একা আনা হয়েছে। এভাবে 'মিসকিন' শব্দটি কুরআনে সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে—

فَكَفَّارَتُهٗ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ - المائدة : ٨٩

একা একা ব্যবহার হয়েছে। এতে ফকিরের অর্থও নিহিত আছে। কিন্তু এ দুটো শব্দই আবার যখন–সূরা তাওবার ৬০ আয়াতে

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ ـ التوبة : ٦٠

পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তখন উভয় শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক ও সীমাবদ্ধ অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে এবং উভয় শব্দই পৃথক পৃথক অর্থে ভাগ হয়ে গেছে।

এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি অর্থাৎ কোনো সাধারণ শব্দের উপর তার কোনো বিশেষ অংশকে সংযুক্ত করে দেবার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ইল্‌মে বালাগাতের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর দিক দৃষ্টিগোচর হয়। এ ধরনের ব্যবহারে কোনো কোনো সময় বিশেষ কোনো শব্দের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ও দিক তুলে ধরা হয় যা সাধারণ শব্দের অন্যান্য অংশে পাওয়া যায় না।

বর্ণনার এমন ধরনের ভঙ্গি ও 'ইল্‌মে বালাগাতের' ব্যবহার বিধি কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। উপরে কিছু আয়াত আমি বর্ণনা করে এসেছি। আরো কিছু দৃষ্টান্ত একটু বিস্তারিতভাবে পেশ করা হচ্ছে—

(١) اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط ـ العنكبوت : ٤٥

"এ কিতাব যা ওহীর মাধ্যমে তোমার উপর নাযিল হয়েছে তা তিলাওয়াত করো আর নামায কায়েম করো।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৫

এখানে 'তিলাওয়াত করো' অর্থ শুধু মুখে শব্দগুলো উচ্চারণ করাই নয়। বরং কুরআনের হুকুম-আহকামের অনুসরণ করাও এর মধ্যে শামিল। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু–সূরা বাকারার ১২১ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط ـ البقرة : ١٢١

"যে সব লোককে আমি কিতাব দান করেছি তারা একে যথাযথভাবে পড়ে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২১

অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত হারাম জিনিসকে হারাম মনে করে আর হালালকে হালাল বলে মানে। এর মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর উপর ঈমান পোষণ করে এবং মুহকাম আয়াতগুলোর উপর নিজের আমলের ভিত্তিস্থাপন করে।

"কুরআনের আহকামের" মধ্যে যেসব হুকুমের অনুসরণ করার জন্য এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে গোটা শরীআতই শামিল। এটা খুবই সুস্পষ্ট কথা। নামাযও গোটা শরীআতের একটি অংশ। কিন্তু এরপরও এ আয়াতে তিলাওয়াতে কিতাব এর উপর ইকামাতে সালাতকে

সংযুক্ত করে এটাকে বিশেষ যত্নের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা যেন এর গুরুত্ব ও মহান মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সূরা আহযাবের ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

(٢) اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ○ الاحزاب : ٧٠

"আল্লাহকে ভয় করো এবং সরলভাবে কথা বলো।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৭০

(٣) اِتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ - المائدة : ٣٥

"আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্নিকটবর্তী হবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৫

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এসব আয়াতে 'তাকওয়ার' উপর 'কাওলে সাদীদ' ও ইবতিগায়ে ওয়াসিলাকে আত্ফ বা সংযুক্ত করা হয়েছে। অথচ কাওলে সাদীদ ও ইবতিগায়ে ওয়াসিলা স্বয়ং তাকওয়ারই পরিপূরক অংশ ও এর শাখা। কিন্তু এসব গুণাগুণ দৃষ্টিতে রাখার পরও 'তাকওয়ার' সাধারণ হুকুমকে বিশেষভাবে আবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব বিশ্লেষণের আলোকে এখন এসব শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যেগুলোকে আপত্তি হিসেবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এগুলোকে "ইবাদাত" শব্দের উপর "তাওয়াক্কুল" ও "ইসতেআনাত" এবং "তাকওয়া" শব্দগুলোকে যদি সংযুক্ত হিসেবে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে এ সংযুক্তির অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, এসব জিনিস ইবাদাতের সীমারেখার বাইরে । বরং ব্যাপারটা হলো যদিও এসব জিনিস ইবাদাতেরই অংশ কিন্তু ইবাদাতের এই আম শব্দ ব্যবহারের পরে একে খাসভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন 'আবেদের' চোখে এর একটি বিশেষ স্থান লাভ হতে পারে এবং 'আবেদ' যেন এসব ঈমানের গুণাগুণকে নিজের মধ্যে বেশী বেশী সৃষ্টি করার ফিকিরে ডুবে থাকে। কারণ এসব জিনিস বাকী সব ইবাদাতকে সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে মৌলিকভাবে গুরুত্বের অধিকারী। এর সাহায্য ছাড়া কোনো ইবাদাতই আদায় হতে পারে না।

সৃষ্টির কামালিয়াতের মাপকাঠি

এ গোটা আলোচনা হতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষসহ যে কোনো সৃষ্টির জন্য কামালিয়াতে পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর

ইবাদাত। যে বান্দাহর ইবাদাত যত বেশী উন্নত হবে তার মর্যাদা বা কামালিয়াত ততবেশী উন্নত হবে। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির জন্যে ইবাদাত-বন্দেগীর স্তর পার হয়ে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া সম্ভব অথবা কোনো সৃষ্টির জন্য কামালিয়াতের স্তরে পৌঁছা ইবাদাত ছাড়াও অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব, তারা জিহালাত ও গুমরাহীর চরম অধপতনে গিয়ে পৌঁছেছে। এ ধরনের গুমরাহীর নীচে আর কোনো গুমরাহী নেই। এ আলোচনার প্রথম দিকে কুরআনের আয়াত দিয়ে আমি একথাগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি। আমি বলেছি যে, আল্লাহ যখন তার কোনো নিকটতম বান্দাহকে প্রশংসামূলক শব্দ দিয়ে ডাকতে চান তখন তিনি তাকে 'আবদ' শব্দ দিয়ে ডাকেন। তার ইবাদাত বন্দেগীই তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঠিক এভাবে যখন কারো নিন্দা ও বদনাম করা হয় তখন তার উপর আল্লাহর ইবাদাতের হক আদায় না করার অপরাধকেই এর কারণ হিসেবে বলা হয়। এ ব্যাপারটিকে কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যত নবী দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সকলকেই এ 'ইবাদাত'-এর নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর দাওয়াতের সূচনায় উম্মতকে ইবাদাত করার নির্দেশ দানের মাধ্যমেই শুরু করেছিলেন।

ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য

ইবাদাতের এ নিগূঢ় তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পর একথাটিও স্পষ্টভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, এ আকাঙ্ক্ষিত গুণটি লাভ করার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। আর এ পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পার্থক্যকে প্রকাশ করে। ইবাদাতের স্তর এবং সিফাতে কামালের দিক থেকে মানুষ দুটি বড় শ্রেণীতে বিভক্ত।

একটি হলো বিশেষ শ্রেণী।
আর অপরটি হলো সাধারণ শ্রেণী।

এরই ভিত্তিতে বিশ্বপ্রতিপালকের সাথেও সকল মানুষের সম্পর্ক এক রকম নয়। বরং এক্ষেত্রেও স্তরগত পার্থক্য হওয়াই জরুরী। কোথাও এ হবে মামুলী ধরনের। আবার কোথাও হবে বিশেষ ধরনের। দুঃখের বিষয় নিরেট তাওহীদ ও সত্যিকারের ইবাদাতের পতাকাবাহী লোকেরাও সূক্ষ্ম শিরক থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيفَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِذَا مُنِعَ سَخِطَ ـ صحيح البخاري

"ধ্বংস হয়েছে দেরহামের দাসরা! ধ্বংস হয়েছে দীনারের দাসরা! ধ্বংস হয়েছে মখমলের দাসরা! ধ্বংস হয়েছে কালো চতুর্ভূজ কাপড়ের দাসরা! ধ্বংস হয়েছে সে এবং উপুড় হয়ে পড়েছে। ওদের অবস্থা এই যে, তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে তারা তা বের করে না অর্থাৎ বিপদে পড়ে বিড়বিড় করতে থাকে, আর যখন কিছু পায় তখন তাতে মগ্ন ও তৃপ্ত হয়ে যায়। যদি কিছু না পায় তাহলে নারাজ হয়ে বসে থাকে।"–বুখারী .

সত্য উদ্‌ঘাটনকারী আল্লাহর রাসূলের উচ্চারিত এসব শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে দুনিয়ার উপায় উপকরণের পেছনে পড়ে থাকা মানুষকে দেরহামের দাস, দীনারের দাস বলে সম্বোধন করেছেন। তাদের জন্যে বদদোয়ার মতো বাক্য উচ্চারণ করেছেন। সাথে সাথে দৃষ্টান্তমূলক ভঙ্গিতে অর্থের পূজারী লোকদের নমুনা এঁকে এরশাদ করেছেন যে, তাদের খুশি ও না খুশীর মানদণ্ড হলো ধন-দৌলত। কুরআন মাজীদেও মানব প্রকৃতির এ দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ـ التوبة : ٥٨

"এসব মুনাফিকদের কেউ কেউ সদকা বন্টনের ব্যাপারে তোমার উপর অভিযোগাত্মক কটাক্ষ করে। যদি ওদেরকে সদকা থেকে কিছু দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা খুশী থাকে। আর যদি কিছু দেয়া না হয় তাহলে সাথে সাথেই অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫৮

মোটকথা তাদের খুশী অখুশী আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয় না। বরং তা হয় স্বার্থের ভিত্তিতে। আর তা মূলত তাদের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ এবং দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ বান্দার বন্দেগীর দাবী হলো, সে নিজের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ভিত্তিস্থাপন করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর। নতুবা সে আল্লাহর বান্দাহ হবার দাবী করা

সত্ত্বেও তাঁর হক আদায় করতে পারবে না। তখন সে মুখে মুখে আল্লাহর বান্দাহ দাবী করবে বটে, কিন্তু কার্যত সে হবে প্রবৃত্তি, ধন-সম্পদ ও টাকা পয়সার দাস।

একইভাবে যে ব্যক্তি ক্ষমতার রূপের কিংবা অনুরূপ অন্য কোনো জিনিসের প্রতি বিমোহিত ও প্রলোভিত হবে সেও ধন-সম্পদ পূজারীর মতই নিজের কাঙ্ক্ষিত জিনিসের পূজারী বলে গণ্য হবে। কারণ, যদি তার মনস্কামনা পূর্ণ না হয় তাহলে সে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এভাবে উপরোল্লিখিত এ ব্যক্তি যদি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনুযায়ী ধন-দৌলতের গোলাম হয় তাহলে এ ব্যক্তিকেও তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসের গোলাম ও দাস বলে আখ্যা দেয়া হবে। কারণ বন্দেগী ও গোলামীর প্রকৃত অর্থই হচ্ছে হৃদয় মনের বন্দেগী ও গোলামী। যে জিনিসই মনকে নিজের গোলাম বানিয়ে নেয় মানুষ প্রকৃতপক্ষে তারই বান্দা ও গোলাম হয়ে যায়। এক কবি কতইনা উত্তম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنَعَ   وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمَعَ

'অল্পের তুষ্ট গোলাম যে, স্বাধীন সেই হয়
গোলাম হয় স্বাধীন লোক লোভী যদি হয়।'

একথাটিই আর একজন কবি এভাবে বলেছেন ঃ

اَطَعْتُ مَطَامِعِيْ فَتَعَبَّدَتْنِيْ   وَلَوْ اِنِّيْ قَنَعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا

'অনুগত পেয়ে কামনা মোরে বানিয়েছে গোলাম,
সংগী হলে তুষ্টি আমার নির্ঘাত স্বাধীন হতাম।'

"বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, "লোভ-লালসা গলার শৃংখল আর পায়ের বেড়ী। গলাকে শৃংখল মুক্ত করার সাথে সাথে পায়ের বেড়ীও দূর হয়ে যায়।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

اَلطَّمَعُ فَقْرٌ وَالْيَاْسُ غِنًى وَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا يَئِسَ فِىْ شَىْءٍ اسْتَغْنٰى عَنْهُ - مشكوت -

"হে মানুষেরা শুনে রাখো। লোভ হলো দারিদ্র আর বিমুখীনতা হলো প্রাচুর্য। তোমাদের কেউ যখন কোনো জিনিস হতে বিমুখ হয় তখন সে এ জিনিসের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যায়।"-মেশকাত

এটা একটা বাস্তব ব্যাপার। মানুষের স্বভাব হলো সে যে জিনিস থেকে নিরাশ হয়ে যায়, সে জিনিস প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তার মন থেকে মুছে যায়। এরপর সে আর তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয় না। আর এ ব্যাপারে সে কাউকে সাহায্যকারী হিসেবেও পেতে চায় না। এর বিপরীত সে যদি কোনো ব্যাপারে আশাবাদী হয় আর তার মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন সে তার জন্য পাগল পারা হয়ে যায় এবং সেটার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। মোটকথা মানবীয় স্বভাবের এটা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ধন-সম্পদ, শান-শওকত, রূপ-সৌন্দর্যসহ যে ব্যাপারেই কথা বলো সবকিছুর কামনার মধ্যেই এ নীতিমালা কার্যকর আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের অসীয়ত করেছেন ঃ

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط ـ العنكبوت : ١٧

"আল্লাহর নিকট রিয্‌ক তালাশ করো। তারই ইবাদাত করো এবং তারই শোকর আদায় করতে থাকো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৭

রিয্‌ক ছাড়া তো কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকেরই তা নিত্য প্রয়োজন। কোথাও না কোথাও তা অর্জন করতেই হয়। কোনো লোক যদি এ রিয্‌ক আল্লাহর নিকট তালাশ করে তাহলে সে আল্লাহর বান্দা হবে এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী হবে। আর যদি আল্লাহকে ছেড়ে কোনো সৃষ্টির কাছে রিয্‌ক তালাশ করে, তাহলে কার্যত সে তারই বান্দাহ হবে। তারই মুখাপেক্ষী হিসেবে সে চিহ্নিত হবে।

সৃষ্টির কাছে চাওয়া নিষেধ

এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির নিকট কিছু প্রার্থনা নীতিগতভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ। শুধু বেশী প্রয়োজনের সময় এ ব্যাপারে অনুমতি আছে। ভিক্ষা বৃত্তি নিষেধ হবার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি হাদীস আছে। যেমন ঃ

(١) لَاتَزَالُ الْمَسْئَلَةُ بِاَحَدِكُمْ حَتّٰى يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ ـ بخارى، مسلم

(১) "যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হাত পাতবে কিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে, তার মুখমণ্ডলে মোটেই গোশত থাকবে না।"–বুখারী, মুসলিম

অর্থাৎ খুবই অপমানকর অবস্থায় সে উঠবে।

(٢) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا اَوْ خُمُوْشًا اَوْ كُدُوْشًا فِيْ وَجْهِهٖ ـ الطبارنى

(২) "যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে হাত পাতবে কিয়ামাতের দিন এ হাতপাতার দাগ তার কপালে প্রকট অথবা হালকা যখমরূপে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ হাতপাতার অবস্থা অনুসারে গভীর যখমের অথবা হালকা যখমের চেহারা নিয়ে সে উঠবে। গোটা মাখলুকের নিকট সে অপমানিত হবে।"–তাবারানী

(٣) لاَتَحِلُّ الْمَسْأَلَةَ اِلاَّ الَّذِىْ غَرَمَ فَعَظِعَ اَوْدَمٍ مَوْجِعٍ اَوْ فَقْرٍ مُدْمَعٍ ـ

(৩) "তিন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলের জন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া হালাল নয়। প্রথম, যে ব্যক্তি ঋণের দায়ে নিগৃহীত, দ্বিতীয়, যে গরীব ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় ভূলুণ্ঠিত, আর তৃতীয় হলো, খুনের অপরাধী, যে রক্তমূল্য দিতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেছে।"

(٤) واللّٰه لاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبُ فَيَحْتَطِبُ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَنْ يَسْئَلَ النَّاسُ اُعْطُوْهُ وَمَنَعُوْهُ ـ بخارى، ابن ماجة

(৪) "আল্লাহর কসম তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ নিজের রশি উঠিয়ে নেয় এবং নিজের পিঠের উপর খড়ির বোঝা উঠিয়ে নেয় ও বিক্রয় করে এবং এভাবে যদি আল্লাহ তাআলা তার আত্মসম্মানকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত রাখেন, তাহলে তার জন্যে কারো নিকট হাতপাতা থেকে অনেক উত্তম।"–বুখারী

(٥) مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّه اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَا اَعْطٰى اَحَدًا عَطَاءً خَيْرًا اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ـ بخارى، مسلم

(৫) "যে ব্যক্তি কারো নিকট হাতপাতা হতে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য দান করেন। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। কাউকে এমন কোনো নেয়ামাত দেয়া হয়নি যা ধৈর্য হতে উত্তম ও বড় হতে পারে।–বুখারী, মুসলিম

(٦) مَا اَتَاكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرَ سَائِلٍ وَلاَ مُسْتَشْرَفٍ فَخُذْهُ وَاِلاَّ فَلاَ تَتْبَعْهُ نَفْسَكَ ـ بخارى، مسلم، نسائى

(৬) "এ (বায়তুল) মাল থেকে যদি তোমাকে কিছু দেয়া হয় আর তুমি নিজে প্রার্থনা করে যদি তা না চাও তোমার মনেও যদি তার

জন্য কোনো আগ্রহ আগ থেকে না থাকে তাহলে তা তুমি গ্রহণ করো। যদি ঘটনা এমন না হয়, তবে এর থেকে তুমি তোমাকে দূরে রাখো।"-বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ

মূলত অর্থ সম্পদে কোনো ত্রুটি নেই বরং এর সম্পর্ক গ্রহণকারীর নিজের নফ্সের সাথে জড়িত। ধন-সম্পদ লাভের জন্য যদি তার মনে কোনোরূপ লোভ-লালসার সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণে কোনো দোষ নেই কারণ এভাবে তো তার আল্লাহর উপর নির্ভরতা অক্ষুণ্ন থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজ মুখে চায় অথবা তার মনের গহীন কোণে যদি এ ব্যাপারে কিছু পাবার আগ্রহ লুক্কায়িত থাকে তাহলে একজন মু'মিন হিসেবে এ মাল স্পর্শ করা তার জন্য ঠিক হবে না। কেননা এখানে সে যে আল্লাহর দাস, তার সে বৈশিষ্ট্য পদদলিত হবার আশংকা আছে।

বিশেষ বিশেষ সাহাবার জন্য কিছু চাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ ছিলো

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো ইসলাম কারো কাছে কিছু চাওয়াকে পসন্দ করে না। শুধু প্রয়োজনের সময় বিশেষ ঠেকা বশত এ ব্যাপারে শিথিলতা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের কিছু বিশেষ বিশেষ সাহাবার ক্ষেত্রে এ শিথিলতা আরোপ ও নিষেধ করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে দৃঢ়তার পথ অবলম্বনের হেদায়াত দিয়েছেন যেনো কোনো সৃষ্টির কাছে হাত না পাতেন। বর্ণিত আছে ঃ

اَبُوْ بَكْرٍ كَانَ يَسْقُطُ السُّوْطُ مِنْ يَدِهٖ فَلاَ يَقُوْلُ لِاَحَدِنَا وَلِىَ اِيَّاهُ وَيَقُوْلُ اِنَّ خَلِيْلِىْ اَمَرَنِىْ اَنْ لاَ اَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا ـ

"আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে কোনো সুঁই পড়ে গেলেও তিনি কাউকে বলতেন না যে, একটু উঠিয়ে দিন। তিনি বলতেন আমার বন্ধু আমাকে কারো কাছে কিছু না চাওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছেন।"

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَايِعْهُ فِىْ طَائِفَةٍ وَاَسَرَّ اِلَيْهِمْ كَلِمَةً خُفْيَةً اَنْ لاَتَسْاَلُو النَّاسَ شَيْئًا فَكَانَ بَعْضُ اُوْلٰئِكَ النَّفَرُ يَسْقُطُ السُّوْطُ مِنْ يَدِ اَحَدَهِمْ وَلاَ يَقُوْلُ لِاَحَدِنَا وَلِىَ اِيَّاهُ ـ مسلم

"সহীহ মুসলিমে আওফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবার সাথে আমারও বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। আমাদের সকলের কানে কানে তিনি একথা বলে দিলেন, কারো কাছে কোনো সময় কিছু চেয়ো না। একথার ফল এ দাঁড়ালো যে, এদের কারো হাত থেকে যদি একটি সুঁইও মাটিতে পড়ে যেতো তাহলেও কাউকে একথা বলতেন না একটু উঠিয়ে দাও তো।"

আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে

একটি দুটি নয় বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও সুন্নাতে রাসূলে এ হুকুম দেয়া হয়েছে—যা কিছু চাইতে হয় প্রকৃত রিযকদাতা হতেই চাইতে হবে। কোনো মাখলুখের কাছে হাত পেতো না।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝ - الانشراح : ٧-٨

"যখন তুমি খালি হাত হয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে যাবে এবং তোমার রবের কাছেই মিনতি জানাবে।"-সূরা আলাম নাশরাহ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط - النساء : ٣٢

"আল্লাহর সমীপেই তাঁর অনুগ্রহ (রিযক) প্রার্থনা করো।"

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ - العنكبوت : ١٧

"আল্লাহর কাছেই রিযক অন্বেষণ করো।"সূরা আল আনকাবূত ঃ ১৭

এ শেষ অংশটুকু হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহর এরশাদ। এ বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ - বলেছেন কিন্তু فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللّٰهِ বলেননি।

কারণ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর কাছে শব্দটিকে আগে ব্যবহার করে রিযক যার কাছে চাইতে হবে তার দিকটাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরাই হলো মূল দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থৎ গায়রুল্লাহর কাছে রিযক চেয়ো না বরং শুধু আল্লাহর কাছেই রিযক তালাশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নসীহত করতে গিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ -

"যদি কিছু চাইতে হয় আল্লাহর কাছেই তা চাও। আর সাহায্য যদি কারো কাছে চাও তা হলে তা আল্লাহর কাছেই চাও।"

স্বভাবগতভাবে প্রত্যেক মানুষেরই
২টি জিনিসের প্রয়োজন

এ দুটি জিনিসের প্রথমটি হলো তার রিয্ক বা জীবিকা ইত্যাদি যা জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজন।

আর দ্বিতীয়টি হলো অনিষ্ট ও ক্ষতিকারক জিনিস হতে নিজেকে হিফাজত করা।

এ দুটো ব্যাপারেই ইসলামের শিক্ষা হলো—এ দুটো জিনিস যখনই চাইবে তখনই আল্লাহর কাছে তা চাইবে। প্রয়োজনের সময়ও তাঁর কাছেই হাত পাতবে। আর বিপন্ন অবস্থায়ও তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উন্নত চরিত্রও আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। নিজের পুত্রের বিরহ ব্যথা যখন আর সহ্য হচ্ছিল না, দুঃখের কষ্টে আপনা আপনিই মুখ নড়তে আরম্ভ করলো এবং শব্দ বেরুতে লাগলো ঃ

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ - يوسف : ٨٦

"আমি আমার আহাজারী ও মনোবেদনা শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করবো।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৮৬

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা 'হিজরে জামীল'-এর উল্লেখ করেছেন উন্নত চরিত্রের পরিচয় হিসেবে। ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

'হিজরে জামীল' এর অর্থ কাউকে কোনো কষ্ট দেয়া ছাড়া নীরবে তার কাছ থেকে কেটে পড়া।

এবং 'সফহে জামীল' এর অর্থ হলো, কপাল ও ভ্রু কুঁচকানোর বিরক্তি দেখানো ছাড়াই কাউকে মাফ করে দেয়া।

এবং 'সবরে জামীল' অর্থ হলো কোনো প্রকার অভিযোগ ছাড়াই বিপদ-আপদ সয়ে যাওয়া।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাতুল্লাহ আলাইহিকে একবার রোগ শয্যায় একথা শুনানো হয়েছিলো—

ইমাম তাউস রাহেমাহুল্লাহু রোগীর আহ! উহ! শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করে কাতরানোকে অপসন্দ করতেন। তিনি বলতেন, এটা হলো মাখলুকের কাছে অভিযোগ। একথা শুনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রোগশয্যায় কাতরানো বন্ধ করে দিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তার মুখ থেকে আর এ আহ! উহ! শব্দ কোনো দিন বের হয়নি।

এখন বাকী রইলো বিপদ মুসীবতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মনের কোনো মিনতি অভিযোগ আকারে নিবেদন করা। এটা কিন্তু সবরে জামীলের বিপরীত কিছু নয়। একথার প্রমাণ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আগে বর্ণিত বাক্যগুলোতে বিদ্যমান। একদিকে তিনি বলেছেন فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ এবং এর পরপরই তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ -

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ, সূরা ইউনুস ও সূরা আন নাহল, তিলাওয়াত করতেন। এসব আয়াতে (اِنَّمَا اَشْكُوْ الخ) পৌছলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তাঁর কাঁদার শব্দ শেষ কাতার পর্যন্ত শুনা যেতো।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন—"হে আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য। তুমি আমাদের মনের কাকুতি শুনার একমাত্র অধিকারী। তুমিই আমাদের ভরসাস্থল, তুমিই আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী। তোমার উপরই আমাদের ভরসা। আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণার তুমিই একমাত্র উৎস।

তায়েফের সেই ময়দানে দুষ্ট দুরাচার জাহিলরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের সাথে যে হৃদয়হীন দুব্যর্বহার করেছিলো তাতেও তাঁর পাক যবান দিয়ে একথাগুলো বের হয়ে আসতে শুনা গিয়েছিলো।

"হে আমার আল্লাহ! আমার অপারগতা, আমার অসহায়তা, আমার অক্ষমতার অভিযোগ তোমার নিকটেই আবেদন করছি। তুমিই অসহায়ের সহায়। তুমিই আমার রব।"

এসব ঘটনা ও বিশ্লেষণের আলোকে এ সত্য কোনো আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর দরবারে নিজেদের অভাব অভিযোগ পেশ করা এবং নিজেদের বিপদ আপদের কথা বলা নিষেধ নয়, খারাপও নয়। বরং এমন এক কাজ যার আদেশ দেয়া হয়েছে। শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে যা পসন্দনীয় কাজ। আল্লাহর যে বান্দা তার প্রয়োজন পূরণের জন্য

তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের যত বেশী প্রত্যাশী হবে বান্দাহ্‌র বন্দেগী ততবেশী মজবুত ও একনিষ্ঠ হবে। গায়রুল্লাহ্ থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হবে। যেভাবে কোনো মাখলুকের কাছে কিছু চাওয়া ও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা তার গোলাম হবার প্রমাণ, তেমনি তাঁর থেকে কিছু পাবার আশা না করা ও তাঁর প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব না করা তাঁর থেকে মনের বিমুখতার প্রমাণ। ঠিক এভাবে নিজের স্রষ্টা ও জীবিকাদাতার প্রকৃত নেয়ামতের প্রতি প্রত্যাশী ও আকৃষ্ট হওয়া তাঁরই গোলামী ও বন্দেগীর নিদর্শন। মানুষের হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে ফিরে থাকা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে উপেক্ষা করারই অর্থ বহন করে।

গায়রুল্লাহ্‌র ভালোবাসাও গায়রুল্লাহ্‌র বন্দেগী

যারা নিজেদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণকে নিজের স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তারা মূলত তা অন্য কোনো মাখলুকের সাথে জুড়ে দেয়। জুড়ে দেয় এমনভাবে যে, তাকেই নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয়। আর তার উপরই নিজের আশা-ভরসা ও নির্ভরতার প্রাসাদ গড়ে তোলে। যেমন কেউ এরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করে নিজের রিয়াসাত, নিজের হুকুমাত, নিজের বাহিনী, নিজের দাস-দাসীর উপর। অন্য এক ব্যক্তি তৈরি করে নিজের পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের উপর। তৃতীয় এক ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদের পাহাড়ের উপর। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি নিজের কোনো মনিব, কোনো শাসক, কোনো মাখদুম, কোনো পীর, কোনো মুরশীদ ও এভাবে অন্যান্য বুযুর্গের প্রতি ফানা হয়ে যায়। অথচ সে যার উপর নির্ভর করে এবং যার জন্য 'ফানা' হয়, তার নিজের তো ফানা হওয়াটা নিশ্চিত ব্যাপার।

এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাহদের হেদায়াত ও নসীহত করেছেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ٥ الفرقان : ٥٨

"নির্ভর করো সেই শক্তির উপর যিনি জীবন্ত। যে শক্তির কোনো ক্ষয় নেই। প্রশংসার সাথে তাঁর পাক পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর তিনিই তাঁর বান্দাহদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য যথেষ্ট।"
—সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৮

এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য, যে ব্যক্তির হৃদয়ই কোনো সৃষ্টির দিকে প্রত্যাশার সাথে ঝুঁকে পড়বে এ অর্থে যে, তার সংকট সময়ে সে কাজে আসবে অথবা তার কাছ থেকে জীবিকা সংগ্রহ করবে, অথবা তাকে সত্য ও সঠিক পথপ্রদর্শন করবে ; তাহলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তার অন্তরে অবশ্যি একটা ভক্তি মর্যাদার সৃষ্টি হবে। সে তার সামনে অসহায়ের মতো মাথা নুইয়ে থাকবে। পরিশেষে এ ধ্যান-ধারণা ও এ ধরনের অসহায় ভাবের কারণে তার মধ্যে তার গোলামী ও বন্দেগী করার অবস্থারও সৃষ্টি অবশ্যই হবে। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে সে তার আমীর, নেতা, মনিব ও হুকুমদাতাই হোক না কেন। কারণ হাকিম বাহ্যিক দিকে দেখে তো সিদ্ধান্ত ও বিচার ফায়সালা করে না বরং তথ্যের ভিত্তিতে তা করে। এ বিরাট সত্যকে বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝুন। আমরা দেখছি, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, শরীআতের দৃষ্টিতে সে নারী তার স্ত্রীই হোক না কেন এরপরেও তার হৃদয় তার তরে বন্দী হয়ে থাকে। তার খুশীমত সে তাকে নাচায়। অথচ স্বামী হিসেবে সে বাহ্যতঃ তার মুরব্বি ও মনিব। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে পুরুষ তার হুকুম বরদার ও আজ্ঞাবহ। বিশেষ করে পুরুষের প্রেম ভালোবাসার কথা সে যখন বুঝে, সাথে সাথে একথাও বুঝে যে, তার বিচ্ছেদ ওর জন্য অসহ্য। আর যাই হোক তাকে ছেড়ে অন্য কোনো নারীর সান্নিধ্য লাভ করার কল্পনাও তার জন্য দুঃসাধ্য। ফলে সে তার উপর এমন শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে যেমন কোনো যালিম ও একনায়ক মনিব তার ক্রয় করা ও অসহায় দাসদাসীর উপর করে থাকে। বরং সে এর চেয়েও শক্ত করে কষে ধরে। কারণ মনের বন্দী শরীরের বন্দী হতে এবং মনের গোলামী দেহের গোলামী হতে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। যদি একজন মানুষের দেহ গোলামীতে বন্দী থাকে কিন্তু তার হৃদয় থাকে বন্দী জীবনের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত, তাহলে তার কোনো পরোয়া থাকে না। বরং কোনো কোনো সময় এ বন্দী জীবন হতে মুক্তিও মিলে যায়। কিন্তু দেহ-রাজ্যের বাদশাহ 'মন'-এর উপর যখন এ বিপদ এসে পড়ে এবং সে কোনো গায়রুল্লাহর হাতে বন্দী হয়। অথবা হালকা গোলামীর মধ্যে আটকে যায় তাহলে সে হয় প্রকৃত গোলাম।এ গোলামীই প্রকৃতপক্ষে অবমাননাকর এবং ইবাদাতের আয়নায় ধরা পড়ার যোগ্য। হৃদয় মনের গোলামী হলো সেই জিনিস যার ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারিত হয়। বস্তুত তোমরা জানতেই পারবে যদি কোনো মুসলমানকে কোনো কাফির অন্যায়ভাবে কয়েদ করে রাখে অথবা কোনো ফাসিক তাকে জোর করে গোলাম বানিয়ে

নেয় তাহলে এ জিনিস তার দীন ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো ক্ষতি সাধন করে না। যদি সে এ গোলামী জীবনের ভেতরও দীনের দাবীসমূহ যথাসাধ্য পূরণ করতে থাকে। এভাবে একজন মুসলমান যদি প্রকৃতই কারো গোলাম হয় আর সে আল্লাহর হকসমূহও পালন করে চলে এবং নিজের দুনিয়ায় মনিবের হকও আদায় করে তাহলে তার জন্য আল্লাহর নিকট দ্বিগুণ প্রতিদান মওজুদ আছে। এমন কি কোনো মুসলমান যদি কাফিরের অধীনে পড়ে কুফরী কালাম পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয় এবং তার ঈমান যদি অটল থাকে, তবে তিনি ইসলামের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। এর বিপরীত যদি কারো দেহ নয় বরং তার মন কোনো সৃষ্টির গোলাম বনে যায়, তাহলে এ কাজ সরাসরি তার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। বাহ্যতঃ সে যদি একটি সাম্রাজ্যের শাসকও হয় তাতেও কোনো ফল হবে না। কেননা আযাদী ও গোলামী মনের উপর নির্ভরশীল, দেহের উপর নয়। যেমন ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের উপর ধনী হওয়া নির্ভরশীল নয়। বরং প্রাচুর্য মনের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত প্রস্তাবে মনের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।

এতো গেলো সেই লোকদের মধ্যকার প্রেমের কথা, শরীআতের দৃষ্টিতে যাদের মধ্যকার ভালোবাসা মুবাহ। এবার আলোচনা করা যাক প্রেমের আরেকটি ধরন সম্পর্কে। তাহলো, কারো মন পর-নারী অথবা কোনো সুন্দর যুবকের ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়। সে তার প্রেমের বেদীমূলে তার সারা দেহ ও মন উজাড় করে দেয়। এরূপ প্রেমের পরিণতি কঠিন আযাব ছাড়া আর কিছু নয়। এসব লোক হতভাগা। এরা আল্লাহর রহমত হতে সবচেয়ে দূরে এবং আযাবের সবচেয়ে নিকটবর্তী। কেননা কোনো অপরূপ প্রেমিক যতক্ষণ ওই রূপের ধ্যান-ধারণায় ডুবে থাকে এবং তার পূজারী হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় মন যে অসংখ্য খারাপ কাজ ও খারাপ খেয়ালের বধ্যভূমী হয়ে থাকে তা কে জানে। যদি ধরে নেয়া হয়, এ ব্যাপারে সে কোনো বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়া হতে বেঁচেও থাকে তবুও প্রিয়তমার কল্পিতরূপে তার হৃদয়-মন সবসময় ডুবে থাকার মধ্যেই তার অনিষ্ট নিহিত। এর চেয়েও সহজ কথা হলো যে, সে কোনো বড় থেকে বড় গুনাহ করে ফেলে আবার তার থেকে এমনভাবে তাওবা করে যে, এ গুনাহ হতে তার মন একেবারেই পবিত্র হয়ে যেতে চায়। এ ধরনের অতি লোভী ও রূপের পূজারীদের অবস্থা মাস্তান ও বেহুঁশ লোকের মত বরং তার চেয়েও বেশী খারাপ হয়। কারণ বেহুঁশের কোনো কোনো সময় হুঁশ ফিরেও আসে কিন্তু প্রেমের নেশাচর নেশাগ্রস্থতা হতে এক মুহূর্তের জন্যও মুক্তি পায় না।

এ রূহানী বিপদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ও শেষ দুর্ভাগ্য হলো এসব লোকের মন আল্লাহর যিকির ও ফিকির থেকে একেবারেই খালি হয়ে যায় এবং ঈমানের স্বাদ অনুভব করা হতে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষের হৃদয় যদি ঈমানের ব্যাপারে সরল-সহজ হতো ও আল্লাহর ইবাদাতের মজা পেতো তাহলে তাদের মনে এর চেয়ে বেশী মজা ও আকর্ষিত জিনিস আর কিছুতেই পরিলক্ষিত হতো না। কারণ এটা হলো মানুষের স্বভাব। মানুষ কোনো প্রিয় জিনিসকে তখনই পরিহার করে যখন তার দৃষ্টিতে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো জিনিস সে দেখতে পায়। অথবা এ ব্যাপারে তাকে আরো কোনো ক্ষতি অথবা মুসীবতে ফেলে দেবার আশংকা দেখা দেয়। অতএব কোনো ভুল ও অনিষ্টকর ভালোবাসা থেকে মানুষের মনকে শুধু আল্লাহর প্রতি খাঁটি ভালোবাসাই মুক্ত করতে পারে। অথবা কোনো বড় ক্ষতির আশংকা প্রকট হয়ে দেখা দিলেই আল্লাহ প্রেমে নিবিষ্ট হতে পারে। আর এই আল্লাহ প্রেমের কারণেই হযরত ইউসুফ আঃ কঠিন পরীক্ষায় বিজয় লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতার রহস্য সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

"এরূপই ঘটল যাতে আমরা ইউসুফকে পাপ ও নির্লজ্জতা হতে বাঁচিয়ে নেই। নিশ্চয়ই সে ছিলো আমার বাছাই করা বান্দাদের একজন।"–সূরা ইউসুফ ঃ ২৪

বুঝা গেলো, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনকে কোনো খারাপ কাজ অর্থাৎ কোনো অসঙ্গত পদ্ধতিতে মানব রূপ-সৌন্দর্যের আকর্ষণে ফেঁসে যাওয়া হতে বাঁচিয়ে রাখেন। ঈমানের নিষ্ঠার কারণে তাকে গর্হিত কাজ হতে হিফাজত করেন। এ কারণেই মানুষ যখন আল্লাহর বন্দেগীতে সত্যিকারের মজা পায় না তখনই তার নফ্স তাকে খাহেশের দাসে পরিণত করে এবং সে তার সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যখন একবার ইবাদাতে নিষ্ঠার মজা পেয়ে যায় এবং এর প্রভাব হৃদয় মনে বসে যায় তখন কোনো আকর্ষণ ছাড়াই নফ্সের খাহিশ তার নিকট আত্মসমর্পণ করে বসে, নামাযের দর্শনের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় আমরা এ সত্যই দেখতে পাই ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ العنكبوت : ٤٥

"নিসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড় বিষয়।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫

অর্থাৎ নামাযের উপকারিতা দু' ধরনের ঃ

এক. স্বভাবগত গর্হিত কাজের (ফাহশা ও মুনকার) অপনোদন। দুই. স্বভাবগত প্রিয়বস্তু (আল্লাহর স্মরণ) অর্জন। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দ্বিতীয়টি প্রথমটির থেকে অধিক উত্তম। কেননা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ইবাদাতই হলো মূল উদ্দেশ্য আর খারাপ ও অপসন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এ পথের একটি আবশ্যকীয় স্তর। অথবা এ কথাটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, এটা উদ্দেশ্য হাসিলের একটি সিঁড়ি। এজন্য কুদরতীভাবে এর অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে হবে। মানুষের মন এমন এক জিনিস যা জন্মগতভাবে সৎ, সত্যনিষ্ঠ ও সত্য সন্ধানী। এ কারণে যখন খারাপ কাজের ধারণা তার সামনে পেশ করা হয় তখন সে তাকে দূরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। কেননা খারাপ কাজ ও খারাপ চিন্তা আকে এভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগাছা ও ঘাস শস্যকে ঢেকে ফেলে। নীচের আয়াতটি এ সত্যটিকে প্রকাশ করে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۞ الشمس : ٩ـ١٠

"যে নিজের নফ্সকে পরিশুদ্ধ করেছে সে নিঃসন্দেহে কামিয়াব হয়েছে। আর যে নফসের খাহিশ পূরণ করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۞ الاعلى : ١٤ـ١٥

"কল্যাণ লাভ করল সে, যে পরিশুদ্ধি অবলম্বন করলো এবং নিজের প্রভুর নাম স্মরণ করলো, নামাযও পড়লো।"–সূরা আ'লা ঃ ১৪-১৫

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط

"হে নবী! মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখ বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا ز ـ النور : ٢١

"যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না থাকতো তাহলে তোমাদের কেউই পরিশুদ্ধ হতে পারতো না।"–সূরা আন নূর ঃ ২১

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে "চোখ বাঁচিয়ে রাখা ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করাকে" নফসের জন্য সবচেয়ে পরিশুদ্ধতম কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, প্রবৃত্তির খাহেশ পূরণ করা হতে দূরে থাকা নফ্সকে পবিত্র রাখার একটি মৌলিক অংশ।

"নফ্সের পরিশুদ্ধির"একটি অর্থ হলো, নফ্সকে গর্হিত কথা ও কাজ, যুলুম, মিথ্যা, শির্কসহ সকল খারাপ কাজ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখা।

ওই ব্যক্তির অবস্থা রূপ ও সুন্দরের পূজারীর মতোই, যে রাষ্ট্রক্ষমতার মোহে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীতে নিজের হুকুম জারী, নেতৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, এ ব্যক্তিও তার সহযোগী ও সাহায্যকারীদের হাতে বন্দী। যদিও প্রকাশ্যে সে তাদের নেতা ও শাসক বলে মনে হবে। কেননা সে তার উপর অবশ্যই নেতৃত্বের খোলস পরে বসে আছে। কিন্তু এ খোলসের আবরণে যে মন বিদ্যমান তা উল্টে ওই সহযোগী ও সাহায্যকারীদের 'ডর-ভয়' ও 'আশা-নিরাশার' উপর নির্ভরশীল। এজন্যই দেখা যায়, তাদের জন্য সে তার ধন ভাণ্ডারের দরযা খুলে রাখে, তাদেরকে বড় বড় জায়গীরদারী দিয়ে দেয়। তাদের অনেক দোষ-ত্রুটি দেখেও দেখে না। সে কেন এমন করে? শুধু এজন্য করে যে, এর দ্বারা তারা তার হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকবে। তার মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী কাজ করে যেতে ত্রুটি করবে না। যদি তারা তা না করে তাহলে তার নেতৃত্ব ও হুকুম জারীর কাজ ব্যর্থ হবে। এ কারণে প্রকাশ্যেই এ ব্যক্তি তাদের নেতা ও সরদার তো বটে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সেই বরং তাদের আজ্ঞাবহ দাস।

যদি আরো গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে, সত্যিকার এ দু ধরনের লোকই একে অপরের গোলাম। ভিতরে ভিতরে উভয়ের মধ্যেই উভয়ের গোলামী বা বন্দেগীর মানসিকতা বিদ্যমান। কেননা এ দুয়ের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখাপেক্ষী। এজন্য এরা সকলেই আল্লাহর ইবাদাতের প্রকৃত মর্ম অনবহিত। এ দু'জনের উপরে উল্লেখিত এ সহযোগিতা আল্লাহর যমীনে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হাসিলের উদ্দেশ্যে যদি হয় তাহলে তাদের অবস্থা ওই দুই ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য অর্জন করা থেকে পৃথক কিছু নয়, যারা বদমায়েশী, রাহাজানি ও ছিনতাইয়ে একে অপরের সাহায্য করে।

ধন-সম্পদের লোভী ব্যক্তিও এ ধরনের অবস্থার শিকারে পরিণত হয়। রূপের পাগল যদি রূপ-লাবণ্যের এবং ক্ষমতার লোভী যদি তার সৈন্য-সামন্ত ও সিপাহসালারের পূজারী হয়, তাহলে এরাও নিজেদের জীবনকে ধন-সম্পদের বন্দেগী ও পূজারীর শিকারে পরিণত করে।

এর অর্থ দুনিয়া ত্যাগ নয়

আমার এ আলোচনা থেকে কারো মধ্যে যেনো এ ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, ইসলাম দুনিয়া ত্যাগ তথা বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেয়। প্রকৃত

কথা হলো বস্তু ও পার্থিব জিনিস দুপ্রকার। কিছু জিনিস এমন আছে যা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের প্রয়োজন। যেমন, পানাহার, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি। একজন মু'মিন বান্দাও এ উদ্দেশ্যেই এসব জিনিস গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এসব জিনিস গ্রহণ করার পদ্ধতি হলো, তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহর দিকে রুজু হতে হবে। তা ছাড়াও যেসব মাল ও আসবাবপত্র যা মানুষ নিজের জৈবিক প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগায় সে সবের অবস্থান তার নিকট ওই ঘোড়া বা ওই গাধার চেয়ে বেশী কিছু নয়, যার উপর সে আরোহণ করে। অথবা ওই বিছানা যার উপর সে বসে। বরং ওই পাদানীর চেয়েও বেশী কিছু নয় যার উপর সে বসে নিজের প্রয়োজন সেরে নেয়। জীবন ধারণের এসব আসবাবপত্র তাকে এমন পাগল পারা করে দেয়নি যে, সে তারই হয়ে যাবে। এবং তার উপর—

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝ المعارج : ٢٠-٢١

"যেমন যখন তার কোনো অনিষ্ট ও ক্ষতি হয় তখন হাহুতাশ শুরু করে দেয়। আর যখন কল্যাণ লাভ করে, তখন কৃপণ বনে যায়। তার অবস্থা এমনতর হয়ে যায়।"–সূরা আল মাআরিজ ঃ ২০-২১

দ্বিতীয় হলো ওই সব জিনিস, যা মানুষের জন্য প্রকৃতিগতভাবে প্রয়োজনীয় নয়, প্রয়োজনের খাতিরেও প্রয়োজনীয় নয়। এজন্য এ ধরনের জিনিসের পেছনে লেগে থাকা ও এগুলোর ধ্যানে মগ্ন থাকা আল্লাহর বান্দাহর কাজ হতে পারে না। এ সব জিনিসের সাথে যদি হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে তাহলে নিশ্চয়ই এ জিনিস তাকে নিজের গোলামে পরিণত করে ছাড়ে।

কোনো কোনো সময় তো নিজের গোলামীতে তাকে এমনভাবে ফাঁসিয়ে নেয় যে, সে তার জন্য গায়রুল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পর্যন্ত শুরু করে। এমন হবার পর তার হৃদয়ে আল্লাহর খাঁটি বন্দেগী ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার ভাব কোনো অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকতে পারে না। বরং তখন সে পরিষ্কারভাবে একথা বলতে চায় যে, তার মধ্যে গায়রুল্লাহর বন্দেগী এবং গায়রুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল পরিপূর্ণভাবে না থাকলেও আংশিকভাবে তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ ধরনের মানুষ আল্লাহর রাসূলের বাণী ঃ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ "ধন-সম্পদের বান্দাহ ধ্বংস হয়েছে" এর প্রথম প্রমাণ। এসব মানুষ নিসন্দেহে ধন-সম্পদ ও টাকা পয়সার বান্দাহ হয়ে থাকে, তা যদি সে আল্লাহর কাছেও চেয়ে থাকে।

কেননা আল্লাহর কাছে চাওয়ার পরও সে তার ফায়সালার উপর ধৈর্যধারণ ও শোকর করে না। বরং আল্লাহ তার মনমত দিলে সে খুব খুশী। আর তা নাহলে সে হয় অখুশী। আল্লাহর বন্দেগীর অর্থ কি এই ? আল্লাহর বান্দাহ তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর খুশীতে রাযী থাকে এবং আল্লাহর অখুশীতে অখুশী ও বেজার থাকে। ওই কাজকে পসন্দ করে, যে কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। ওই কাজকে ঘৃণা করে যে কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঘৃণা করেন। আল্লাহর বন্ধুকে বন্ধু ও আল্লাহর শত্রুকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে। এমন ব্যক্তিরাই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। ঈমানের মুয়াল্লিম হাদিয়ে কামেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে এরশাদ করেছেন :

(١) مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

- ابو داود

(১) "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকেও ভালবেসেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে শত্রুতা করেছে, আল্লাহর জন্যই দান করেছে আবার আল্লাহর কারণেই দান করা হতে বিরত থেকেছে, সে ব্যক্তি ঈমানকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে।"

(٢) اَوْثَقُ عُرَى الْاِيْمَانِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ -

(২) "ঈমানের সবচেয়ে মযবুত রজ্জু হলো মানুষ আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করবে।"

(٣) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وُجِدَ حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ - مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ فِيْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ -

بخارى، مسلم

(৩) "যার মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে।

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে বেশী প্রিয়।

২. যাকেই ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে।

৩. কুফরী হতে ফিরে আসার পর আবার কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মত অপসন্দ করে।"

কেউ যখন ঈমানের এ সোপানে পৌছে যাবে তখনই সে নিজের পসন্দ ও অপসন্দকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারবে। এ সময় দুনিয়ার সব জিনিস হতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রিয় হবে। আর আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কাউকে সে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা করবে না। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কাউকে ভালোবাসা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাসারই শামিল। বরং তার পরিপূর্ণতার একটি দিক। ভালোবাসার এটাই নিয়ম।

রাসূলের ভালোবাসার মূলকথা

এর থেকে আল্লাহর নবী এবং অলীদের ভালোবাসার কথা বুঝা যায়। এসব বুযুর্গদের তারা শুধু এ জন্য ভালোবাসে যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় পথের দিকে আহবান জানায়। তাই তাঁদেরকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদেরকে তো আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসা হয়, ব্যক্তিগত কারণে নয়। কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○ المائدة : ٥٤

"অচিরেই আল্লাহ এমন অনেক লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন যারা হবে আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহ হবেন তাদের প্রিয়। তারা মুমিনের প্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর।"

—সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪

বুঝা গেলো, মু'মিন ও আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে নম্রতা-ভদ্রতা, ভালো ব্যবহার করা আল্লাহকে ভালোবাসারই অন্তর্ভুক্ত এবং তারই এক প্রাকৃতিক দাবী। এ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ ال عمران : ٣١

"(হে রাসূল!) বলো, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাহ হিসেবে কবুল করে নেবেন।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

এর কারণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সেইসব কাজ করারই হুকুম দেন আর নিজেও তা করেন, যেসব কাজ আল্লাহ

পসন্দ করেন। তিনি ওই সব কাজ থেকে বিরত রাখেন ও নিজেও বিরত থাকেন যেসব কাজ আল্লাহর অপসন্দ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করবে তার জন্যে রাসূলকে অনুসরণ করা আবশ্যক। 'গায়েব' ও 'হাজির' সম্পর্কে তিনি যেসব খবর দিয়েছেন তা হৃদয় দিয়ে সত্য বলে মানতে হবে। তার এক একটি হুকুমের সামনে সানন্দে মাথা নত করতে হবে। বাস্তব জীবনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে রাসূলের অনুসৃত নীতি দেখে নিতে হবে। যে ব্যক্তি এভাবে কাজ করেছে সে-ই আল্লাহকে ভালোবাসে এ দাবীতে সঠিক ও পরীক্ষায় সফল হলো। পরিণতিতে এ ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তিতে ধন্য হবে।

আল্লাহকে ভালোবাসার প্রকৃত নির্দশন

দুটি জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালোবাসার নির্দশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১. রাসূলের ইত্তেবা ও

২. জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর অর্থ ঈমান ও আমলে সালেহ হাসিল করার ব্যাপারে এবং আল্লাহর অপসন্দনীয় কাজ কুফর ও ফিস্‌ক এবং আল্লাহদ্রোহিতা ও নাফরমানিকে মিটিয়ে দেবার জন্য নিজের সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُ كُمْ وَاَبْنَاؤُ كُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ

نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ

اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

"(হে নবী!) ওদেরকে বলো ঃ তোমাদের মাতা-পিতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের ওই ধন-সম্পদ যা কামাই করে রেখেছো, তোমাদের ওই ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা হয়ে যাবার ভয় করো, তোমাদের সেই ঘরবাড়ী যা তোমাদেরকে সম্মোহিত করে রেখেছে, এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে (এ ব্যাপারে) আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ২৪

লক্ষ্য করুন, যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হতে নিজেদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদকে বেশী ভালোবাসে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কত ভয়াবহ শাস্তির ধমক শুনিয়েছেন।

এভাবে রাসূলের ভালোবাসা প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) নিজে পরিষ্কার ভাষায় এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ رواه الشيخان

"সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার সন্তান, তার পিতা-মাতাসহ অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।"

আর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّامِنْ نَفْسِى ـ

"হে রাসূল! আমি আমার জীবন ছাড়া আর সকল জিনিস থেকে আপনাকে বেশী ভালোবাসি।"

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

لَا يَاعُمَرُ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ـ

"না, হে ওমর! তুমি পাকা মু'মিন হতে পারবে না যতোক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও বেশী প্রিয় হবো।"

একথা শুনেই হযরত ওমর উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ঃ

فَوَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِى ـ

"আল্লাহ সাক্ষী হে রাসূল ! আপনি আমার জীবনের চেয়েও আমার নিকট বেশী প্রিয়।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اَلْاٰنَ يَا عُمَرُ ـ

"এখন ঠিক হয়েছে, হে ওমর।"

বুঝা গেলো, পরিপূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য প্রেমাষ্পদের সাথে পরিপূর্ণ ভালোবাসার সঠিক জয্বা সৃষ্টি করতে হবে। পরিপূর্ণ ভালোবাসার

অর্থ ও তার মানদণ্ড হলো নিজের পসন্দ ও অপসন্দ এবং নিজের ভালোবাসা ও শত্রুতা, প্রিয়তমের পসন্দ ও অপসন্দ এবং ভালোবাসা ও শত্রুতার জন্যই হয়ে থাকে। এটা তো জানা কথাই যে, প্রকৃত প্রিয়তম আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় বিষয় হলো, ঈমান ও 'তাকওয়া' আর অপসন্দনীয় বিষয় হলো 'নাফরমানী' ও 'ফাসেকী'। এভাবে একথাও খুবই সুবিদিত সত্য যে, ভালোবাসা চর্চার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে একটা বড় শক্তি সঞ্চিত হয়। মানুষের হৃদয়ে যখন তা বাসা বাঁধে তখন আকাঙ্ক্ষিত জিনিস প্রাপ্তির ব্যাপারে তাকে বারবার অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকে। ভালোবাসা যদি চরম সীমায় পৌছে যায় তাহলে কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জন করার ব্যাপারেও মনোবাঞ্ছা চরম সীমায় পৌছে যায়। এখন বান্দাহ যদি বাহ্যিক অনেক উপায় উপকরণের অধিকারীও হয়, তবু তা অর্জন করা ছাড়া ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু যদি প্রকাশ্য উপায় উপকরণের অনুপস্থিতির কারণে নানা ধরনের অসুবিধা তার পথ আগলে ধরে এবং প্রাণপণ চেষ্টার পরও যদি তা হাসিল করতে না পারে তারপরও তাকে ব্যর্থকাম বলা যাবে না। এ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার জন্য ঐ পরিমাণ পুরস্কার বিদ্যমান আছে নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টার দ্বারা বাস্তবে সে যে পরিমাণ সফলকাম হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ اجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا ضَلَالَةً كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ اَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

"যে ব্যক্তি মানুষকে কোনো হেদায়াতের দিকে আহবান জানাবে সে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করা ব্যক্তির মতই সমান সওয়াব পাবে। এ সওয়াবে একটুও কম করা হবে না। ঠিক একইভাবে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানাবে সে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ অবলম্বন করা ব্যক্তির সমান শাস্তি ভোগ করবে। এতে একটুও কম বেশী হবে না।"

পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক কোনো কারণে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَاسَرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ ـ قَالُوْا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ـ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَلَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

"মদীনায় থেকে যাওয়া কিছু লোক যুদ্ধের প্রতিটি ময়দানে তোমাদের জিহাদী কাজের সাথে তোমাদের সাথে ছিলো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন—মদীনায় বসে থেকেও কি তারা আমাদের সাথে ছিলো? জবাবে তিনি বললেন, মদীনায় বসে থেকেও। কারণ তারা নিজ ইচ্ছায় বসে থাকেনি বরং সঙ্গত ওযরই তাদের বিরত রেখেছে।"

জিহাদের অর্থ যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর পসন্দনীয় জিনিস হাসিল এবং তা প্রতিফলিত করার এবং অপসন্দনীয় ও নিন্দনীয় জিনিসগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করার কাজে নিজের সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। অতএব জিহাদই হলো প্রকৃতপক্ষে ওই কষ্টিপাথর যার দ্বারা আল্লাহর বান্দার আল্লাহর ভালোবাসা দাবী করার ব্যাপারটি যাচাই করা যেতে পারে। শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি সে অনুযায়ী জিহাদের মত ফরয কাজ পালন না করে তাহলে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ফরয কাজটি আদায়ের ব্যাপারে সে নিজের সামর্থ অনুসারে যত অবহেলা অমনোযোগিতা দেখাবে ততোটাই তা ভালোবাসার দাবীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়বে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এ ফরয পালন করে চলার পথে কাটা বিছানো থাকে। কিন্তু ভালোবাসার এ সুন্নাত কার অজানা আছে যে, প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভ বিপদাপদ ও ঝুঁকি পোহাবার পরই ভাগ্যে জুটে। খাঁটি ও মেকি উভয় ভালোবাসার একই পদ্ধতি। ক্ষমতা লাভের লোভী রাজসিংহাসনকে ধন-সম্পদ প্রাপ্তির পূজারী ধন-ভাণ্ডারকে রূপ-যৌবনের পাগল প্রেয়সীর সাথে মিলনের ব্যাপারটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে না। যতক্ষণ না পরকালীন জীবনের কঠিন আযাবের কথা বাদ দিলেও এ দুনিয়ার ভয়াবহ বিপদাপদ দ্বারা সে জর্জরিত হবে। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমিক তাদের লাভের পথে এতটুকুন জীবন বাজীও যদি না দেখায় যতটুকু গায়রুল্লাহ প্রেমিকরা দৃঢ় সংকল্প চিত্তে নিজেদের প্রিয়তমার জন্য দেখাতে পারে, তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের ভালোবাসার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার অকাট্য একটি প্রমাণ পেশ করলো। অথচ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশী ভালোবাসবে। কুরআন বলছে ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - البقرة : ١٦٥

"ঈমানদারগণ আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে।"

সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে শুধু আবেগ ও সরলতাই মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছার গ্যারান্টি হতে পারে না। এর সাথে সাথে বরং বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতাও থাকা প্রয়োজন। নতুবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, খাঁটি প্রেমিক খাঁটি প্রেম পোষণ করার পরও নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে এবং ধারণার অস্বচ্ছতার কারণে এমন পথ অবলম্বন করে বসবে, যে পথে কখনো নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। খাঁটি ভালোবাসার ব্যাপারেও এ ধরনের ভুল পথ নিন্দনীয়। আর যদি মেকী ও ভ্রান্ত ভালোবাসায় এ ধরনের কোনো পথ অবলম্বন করা হয় তাহলে তো ওই ব্যক্তির বঞ্চনার ব্যাপারে আর কোনো কথাই নেই। যেমন রাষ্ট্র, ধন-সম্পদ, ধন-দৌলত ও রূপ-সৌন্দর্যের কিছু অন্ধ পাগল করে থাকে। একদিকে তো তার ভালোবাসার গতিই ভ্রান্ত অপরদিকে সে নিজের ইপ্সীত লক্ষ্য হাসিলের ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সে সবকিছু হতেই বঞ্চিত। অবশ্য এ পথে নানা ধরনের বিপদাপদ তাকে ঘিরে ফেলে। অতএব ভালোবাসার পথে বুদ্ধিমতা দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। অন্যথায় পরাজয় নিশ্চিত।

বিস্তারিত বর্ণনার পর একথা সহজেই বুঝে এসে যায় যে, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা যত বেশী হবে তার ইবাদাতেও ততোবেশী প্রাণসত্তার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ ছাড়া আর সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে সে স্বাধীন ও মুক্ত হতে থাকবে। এভাবে তার মধ্যে ইবাদাতের রং যত গাঢ় ও গভীর হবে ততোই আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা এবং গায়রুল্লাহ হতে মুক্ত হবার নিদর্শন তার মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

জন্মগতভাবেই মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী

আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। এ মুখাপেক্ষিতার সাথে অপারগতা অসহায়তার ভাবও নিহিত। এ মুখাপেক্ষিতার দুটি দিকে আছে। একটি দিক হলো, দাসত্বের দিক। আর অপরটি হলো সাহায্য চাওয়ার দিক। মানব-হৃদয় আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর মহাব্বত ও নৈকট্য লাভ করা ছাড়া কখনো প্রকৃত নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারে না। পারে না প্রকৃত তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করতে। আর না পারে হৃদয়ের প্রশান্তি ও অবিচলতা হাসিল করতে। এটা হাসিল করতে না পারলে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও তৃপ্তি হস্তগত করার পরও সে বঞ্চনার হা-হুতাশ করে বেড়াবে। প্রকৃত প্রশান্তি ও তৃপ্তি হতে মাহরুম

থাকবে। কারণ মানুষতো প্রকৃত প্রিয়তম-আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক আকর্ষণ থেকে সে কখনো পরিপূর্ণ আযাদ হতে পারবে না। আর নিজের রবের কাছে তার স্বভাবজাত মুখাপেক্ষিতা হতেও সে বের হয়ে যাবে এমনও তো হতে পারে না। এর কারণ হলো, তিনিই তো প্রকৃতপক্ষে তার আসল মাবুদ ও মাহবুব। আর তাঁকে লাভ করেই সে সত্যিকার অর্থে প্রশান্তি তৃপ্তি ও অবিচলতা অর্জন করতে পারে। এ কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে সে লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন। নতুবা গোটা বিশ্বজগতে তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে তার কাজে আসতে পারে। এ দুটি সত্যকে সামনে রেখে মানুষের মন সবসময়ই إِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং এ সত্যের প্রতিও স্বভাবগতভাবেই মুখাপেক্ষী থাকে। আর এভাবে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর হাকীকত ও স্পীরিটের প্রতিও মানুষ মুখাপেক্ষী থাকে।

এভাবে সে আল্লাহকে নিজের সত্যিকার লক্ষ্যস্থল মনে করে বটে এবং তাঁকে পাবার চেষ্টাও করে বটে, কিন্তু এর চেষ্টা প্রচেষ্টায় না আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করে আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য না নিজেকে তাঁর সাহায্যর মুখাপেক্ষী মনে করে। এবং না এ ব্যাপারে মনে করে একমাত্র আল্লাহই তার আশা-ভরসার স্থল। তাহলে কোনো সময়েই সে তার লক্ষ অর্জনে সমর্থ হবে না। কারণ কোনো জিনিস পাওয়া না পাওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। মোটকথা মানুষ দুই দিক থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে মুখাপেক্ষী।

এক. আল্লাহই তার প্রকৃত লক্ষ্যস্থল মাহবুব ও মাবুদ। দুই, একমাত্র তিনিই তার কাজ সম্পাদনকারী, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, আশা ভরসার কেন্দ্র ও নির্ভরস্থল।

অন্য কথায় তিনিই তার "ইলাহ", তিনি ছাড়া তার কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তার 'রব', তিনি ছাড়া তার কোনো মালিক ও প্রভু নেই। এজন্য মানুষের ইবাদাত পরিপূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না এ দুটো জিনিস তার মধ্যে বর্তমান থাকবে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গায়রুল্লাহকে মহব্বত করে অথবা তার কাছে সাহায্য পাবার আশা পোষণ করে, তবে প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি তার এ মহব্বত ও আশা পোষণের পরিমাণ অনুযায়ী ওই গায়রুল্লাহর বান্দাহ। তবে যদি গায়রুল্লাহর সত্তার প্রতি মহব্বত তার না হয় বরং আল্লাহর জন্যই হয় ; আল্লাহ ছাড়া কখনো কারো উপর সে কোনো আশা না করে, যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে

নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে সেগুলো সম্পর্কে তার স্পষ্ট বিশ্বাস থাকে যে, এসব আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, এগুলো নিজ থেকে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, এসব অন্য কারো ইশারা ইঙ্গিতেও সৃষ্টি হয়নি, বরং পৃথিবীর ভূতল থেকে সু-উচ্চ আকাশ পর্যন্ত যত জিনিস আছে, এগুলো সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতিপালক এবং মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা আর সবকিছুই সবদিক থেকে শুধুমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাহলে বুঝতে হবে সে তার ভাগ্যানুযায়ী পরিপূর্ণ ইবাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এ সৌভাগ্য অর্জনে মানুষের শ্রেণী বিভাগ এত বিভিন্ন যে—তা একমাত্র আল্লাহই নির্ণয় করতে পারেন। মানুষের মধ্যে মর্যাদা, পরিপূর্ণতা, গুরুত্ব ও বুযুর্গ এবং হেদায়াত ও আল্লাহর নৈকট্যের দিক থেকে ওই ব্যক্তিই সবচেয়ে উন্নত যার ইবাদাত বন্দেগী উপরোল্লিখিত সবদিক থেকে সবচেয়ে উন্নত। এই হলো দীন ইসলামের মর্মকথা।

এ দীনের তালীম ও তাবলীগের জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। নাযিল করেছেন তাঁর অসংখ্য আসমানী কিতাব। অর্থাৎ বান্দাহ সবসময় সবদিক থেকেই নিজকে আল্লাহর হুকুমের অনুগত বানিয়ে রাখবে। কণা পরিমাণও গায়রুল্লাহর হুকুম মেনে চলবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকেও মানবে সাথে সাথে অন্য কাউকেও মান্য করার মতো অধিকার প্রদান করবে সে মুশরিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর হুকুম মেনে চলাকে আদপেই সমর্থন করে না সে ব্যক্তি চরম হঠকারিতায় নিমজ্জিত।

অহংকার ও আনুগত্যের বৈপরিত্য

হঠকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَمَا اَنَّ النَّارَ لَايَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ۔

"মনে রেখো, ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার ও হঠকারিতা আছে। যেমন ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যার মনে এক কণা পরিমাণ ঈমান আছে।"

ঈমানের প্রশিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহংকার ও ঈমান একটি অপরটির বিপরীত জিনিস।

কারণ অহংকার-হঠকারিতা ইবাদাতের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। নীচের হাদীসে কুদসী থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় ঃ

يَقُولُ اللّٰهُ الْعَظَمَةُ اِزَارِى وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ - مسلم

"আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত বলেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব আমার 'ইজার' আর অহংকার আমার 'চাদর'। যে ব্যক্তি এ দুটো জিনিস আমার থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে তাকে আমি কঠিন সাজা দেবো।"

বুঝা গেলো শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার আল্লাহ তা'আলার খাস বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সৃষ্টির কেউ এসব বৈশিষ্ট্যের অংশ পেতে পারে না। এ দুটো জিনিসের মধ্যে অহংকারের স্থান শ্রেষ্ঠত্বের উর্ধে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অহংকারকে 'চাদরের' স্থানে গণ্য করেছেন। শ্রেষ্ঠত্বকে গণ্য করেছেন 'ইজার' হিসেবে। 'চাদর' ইজারের (লুঙ্গি) চেয়ে উঁচু মানের। এ কারণেই আযান, নামায ও দুই ঈদের নিদর্শন 'আল্লাহু আকবর'কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ জন্য যখন একজন মুসলমান 'সাফা' 'মারওয়া' অথবা কোনো উঁচু জায়গায় চড়ে থাকে অথবা কোনো আরোহীর উপর আরোহণ করে তখন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনী দেবে। এ ধ্বনী দেয়া মুস্তাহাব। এ তাকবীর ধ্বনীতে দুর্দমনীয় শক্তি নিহিত আছে, যে শক্তিতে দাউ দাউ করে জ্বলা লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে নিভে যায়। এ ধ্বনীর শব্দ শুনে শয়তান তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝ المؤمن : ٦٠

"আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের কাকুতি শুনবো। যে ব্যক্তি নিজকে বড় মনে করে ও আমার ইবাদাত থেকে ফিরে থাকে, সে খুব তাড়াতাড়ি অপমান ও লাঞ্ছনার জগত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
—সূরা আল মু'মিন ঃ ৬০

অহংকারের মধ্যে শিরকের অস্তিত্ব বিদ্যমান

যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে সে যেনো একথা না মনে করে, সে আনুগত্য বা 'বন্দেগী' হতে একেবারেই মুক্ত হয়ে গেছে। বরং সে অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া অপর কারো না কারো 'বন্দেগীর' জোয়াল নিজের কাঁধে জুড়ে নিয়েছে। কারণ মানুষ অনুভূতিহীন কোনো অচেতন জিনিস নয়। বরং প্রকৃতিগতভাবেই সে একটি অনুভূতি সম্পন্ন সত্তা। সহীহ হাদীসে আছে ঃ

"হারিছ" ও "হাম্মাম" শব্দ দুটি সবচেয়ে বেশী সত্য, অস্তিত্ব সম্পন্ন নাম। অর্থাৎ মানুষের বিশেষণ।

"হারিছ অর্থ হলো অর্জনকারী, ক্রিয়া ও কর্ম সম্পাদনকারী। আর হাম্মাম অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণকারী। অতএব 'ইচ্ছা' মানুষের একটি চিরন্তন বিশেষণ। এ বিশেষণ থেকে সে খালি হতে পারে না। প্রত্যেক ইচ্ছারই একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই থাকে। এ দুটো কথা মেনে নেবার পর এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটি আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য থাকে। এ আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরেই তা রচিত হয়। এখন যদি কোনো লোকের মা'বুদ ও মাহবুব আল্লাহ না হয় এবং সে আল্লাহর ভালোবাসা ও তার কাছে কিছু চাওয়া পাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন মনে করে, তাহলে কোনো না কোনো গায়রুল্লাহ তার মা'বুদ ও মাহবুব অবশ্যই হবে। সে নিজেকে ওই গায়রুল্লাহর গোলাম বানিয়ে রাখবে। যেমন ধন-সম্পদ অথবা শান-শওকাত অথবা রূপ-লাবন্য অথবা আল্লাহ ছাড়া তার নিজের মনগড়া কোনো মা'বুদ যেমন চাঁদ সুরুজ, গ্রহ-তারা মূর্তি-প্রতিমা, নবী-রাসূল ও অলি-কুতুবদের কবরসমূহ ইত্যাদি। অথবা কোনো নবী, কোনো ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো জিনিস আল্লাহ ছাড়া যার সে পূজারী। সে যখন কোনো না কোনো গায়রুল্লাহকে পূজা করে তখন তার মুশরিক হবার আর কি বাকী থাকে? সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারী হবে সে মুশরিক হবে। ফিরআউন এ সত্যের এক জীবন্ত সাক্ষী। সে ছিলো পৃথিবীর এক সেরা অহংকারী। সাথে সাথে সে ছিলো একজন মুশরিকও। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ফিরআউন একজন অহংকারী হবার প্রমাণ পওয়া যায়।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ...... وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ..... كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ - المؤمن : ٢٦-٢٧، ٣٥

"এবং ফিরআউন বললো ঃ আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করে দিই। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। .... মূসা বললো, যে হিসেবের দিনের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে না, সে অহংকারী থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই.........। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অহংকারী ও যালিমের মনে মোহর মেরে দিয়ে থাকেন।"

—সূরা আল মু'মিন ঃ ২৬-২৭, ৩৫

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ○ - العنكبوت : ٣٩

"এবং কারূন, ফিরআউন ও হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি মূসা এদের কাছে স্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহমিকা ও অহংকারের আচরণ অবলম্বন করলো। অথচ তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলো না।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৩৯

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ○ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ○

"কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন সেই লোকদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তখন তারা বলে উঠলো, এটাতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা সরাসরি যুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করলো। অথচ তাদের মন এগুলোকে মেনে নিয়েছিলো। এখন লক্ষ্য করো এ বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।"
–সূরা আন নামল ঃ ১৩-১৪

আর ফিরআউনের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ মুশরিক হবার সাক্ষ্য কুরআনের এসব আয়াত থেকে পাওয়া যায় ঃ

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط - الاعراف : ١٢٧

"এবং ফিরআউনকে তার জাতির সরদাররা বললো ঃ আপনি কি মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে এভাবে দেশে অশান্তি বিস্তার করার জন্য মুক্ত ছেড়ে দেবেন ? আর তারা আপনার ও আপনার মা'বুদদের বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে ?–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১২৭

প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি শুধু মুশরিকই হয় না বরং অভিজ্ঞতায় বলে দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী ও অনুগত্যের সাথে যতোবেশী বিদ্রোহ করে, ততোবেশী সে পাক্কা মুশরিক হয়ে যায়। কেননা আল্লাহর হুকুমের সাথে সে যত বেশী বিদ্রোহ করতে থাকে ততবেশী সে কোনো না কোনো মনোবাঞ্ছা পূরণকারীর মুখাপেক্ষী ও পূজারী হয়ে যায়। সে তখন এদের

আসল উদ্দেশ্য ও আশা ভরসার স্থল হয়ে যায়। মানুষ যখন তার মূল লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলাকে তাদের মন থেকে বের করে দেবে, তখন অন্য কোনো না কোনো জিনিস সে স্থান এসে দখল করে নেবে। যে কোনো সৃষ্টি বা গায়রুল্লাহ থেকে মানুষের মন মুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন হওয়া ততোক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব যতক্ষণ না সে আল্লাহকে তার আসল কাঙ্ক্ষিত মনিব ও মাওলা হিসেবে গ্রহণ করবে। এমন 'মনিব' ও 'মাওলা' যাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না, কারো কাছে কিছু চাইবে না। কারো উপর ভরসা করবে না। শুধু এমন জিনিসকে পসন্দ করবে যা আল্লাহর পসন্দ। ওই জিনিসকে অপসন্দ করবে যা আল্লাহর নিকটও অপসন্দনীয়। আল্লাহর বন্ধুকে নিজের বন্ধু, তাঁর শত্রুকে নিজের দুশমন বলে মনে করবে। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করবে। এ অদৃশ্য বিশেষণের নামই হলো "ইখলাসে দীন।" এ ইখলাস যতবেশী গভীর ও মযবুত হবে আল্লাহর বন্দেগীও তত বেশী মযবুত ও পরিপূর্ণতা লাভ করবে। বন্দেগীর পরিপূর্ণতায় পৌঁছাই অহংকার ও শিরক হতে বাঁচার একমাত্র উপায়। এ দুটি রোগই আহলে কিতাবদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো। নাসারাদের উপর শিরকের প্রভাব ছিলো। আর ইহুদীদের উপর প্রভাব ছিলো অহংকারের। কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ

اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

"এসব লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ওলামা মাশায়েখদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে। এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করার হুকুম দেয়া হয়নি। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউই বন্দেগী পাবার হকদার নয়। তিনি তাদের বলা এসব মুশরিকী কথাবার্তা হতে পাক ও পবিত্র।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩১

ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز

وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝ - البقرة : ٨٧

"যখনই এমন কোনো নবী তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে তখনই তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে

তাঁর চেয়ে বড় মনে করে তাঁর বিরোধিতা করেছো। কাউকে মিথ্যাবাদী বলেছো আর কাউকে হত্যা করেছো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৭

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ط ـ الاعراف : ١٤٦

"কোনো অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়, আমি তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে সরিয়ে রাখবো। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনো ঈমান আনবে না। সঠিক সহজ ও সরল পথ তাদের সামনে এলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। বাঁকা পথ দেখতে পেলে তাকেই পথরূপে গ্রহণ করে চলবে।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ১৪৬

প্রত্যেক নবীর দীনই ছিলো ইসলাম

যেহেতু অহংকার ও শিরক একই অর্থ বহনকারী এবং শিরক ইসলামের বিপরীত ও বড় গুনাহের কাজ এবং এ গুনাহ আল্লাহর কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী তার দরবারে ক্ষমার অযোগ্য, তাই সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত নবী দুনিয়ায় এসেছেন প্রত্যেকেই এ দীন 'ইসলাম' নিয়েই এসেছেন। তাই একমাত্র এ দীনই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজের জাতিকে উদ্দেশ করে বলেছেন ঃ

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ ط اِنْ اَجْرِيَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ لا وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝ يونس : ٧٢

"তোমরা যদি আমার কথা না শুনো (তো আমার কি ক্ষতি করলে?) আমি তোমাদের নিকট হতে কোনোই প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে (কেউ মেনে নিক আর না নিক) আমি নিজে যেনো মুসলিম হয়ে থাকি।"–সূরা ইউনুস ঃ ৭২

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াত ও এরশাদ এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ البقرة : ١٣١-١٣٢

"তাঁর অবস্থা এই ছিলো যে, তাঁর রব যখন তাকে বললেন, 'মুসলিম' (অনুগত) হও। তখনি সে বললো, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের অনুগত হলাম। এ পন্থায় চলার জন্য সে তার সন্তানদেরও হুকুম দিয়েছিলো। ইয়াকুবও তাঁর সন্তানদের এই উপদেশই দিয়েছিলো। সে বলেছিলোঃ হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দীন-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' হয়েই থাকবে।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ১৩১-১৩২

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন ঃ

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ○ - يوسف : ١٠١

"(হে আমার রব!) ইসলামের আদর্শের উপরই তুমি আমাকে মৃত্যু দিও। আর সালেহীন ও সৎকর্মশীলদের সাথে তুমি আমার মিলন ঘটাও।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০১

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে বললেন ঃ

يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ○ - يونس : ٨٤

"হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁর উপরেই ভরসা করো। যদি তোমরা প্রকৃতই মুসলিম হও।"–সূরা ইউনুস ঃ ৮৪

তাওরাত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন—বনী ইসরাঈলের সকল নবী যারা তাওরাতের শরীআতের প্রচারক ও অনুশীলনকারী ছিলেন, তাদের দীন এ ইসলামই ছিলো।

إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا - المائدة : ٤٤

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। তাতে হিদায়াত ও নূর ছিলো। সকল নবী যারা ছিলো মুসলিম, এরি ভিত্তিতে ইহুদীদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করতো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

সাবার রাণীর সামনে যখন সত্যের আলো জ্বলে উঠলো সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ النمل : ٤٤

"হে আমার মালিক ! এতদিন পর্যন্ত আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। এখন আমি সুলাইমানের সাথে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে (মুসলিম হলাম) আত্মসমর্পণ করলাম।"
–সূরা আন নামল ঃ ৪৪

ঈসা আলাইহিস সালামের সাথীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَاِذَا اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ج قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ۝ - المائدة : ١١١

"এবং স্মরণ করো আমি যখন হাওয়ারীদের ইশারা করে বললাম, আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তখন তারা বললো, আমরা ঈমান আনলাম আর সাক্ষী থেকো আমরা মুসলিম।"
–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১১

কুরআনে হাকীমের এসব ব্যাখ্যা হতে এ সত্য একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের দীন ছিলো ইসলাম। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন, ইসলামের রাজপথই একমাত্র রাজপথ যা আমার দরবারে গ্রহণীয়।'

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - ال عمران : ١٩

"নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণীয় দীন।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج - ال عمران : ٨٥

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করে তার সে দীন কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম

প্রত্যেক নবীই যে, ইসলাম নিয়ে এসেছেন শুধু তা-ই নয়, বরং ইসলামই আদম সন্তানের একমাত্র দীন। ইসলাম গোটা পৃথিবীর দীন। কুরআন বলছে :

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ○

"এসব লোকেরা কি আল্লাহর দীন ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আসমান যমীনের সবকিছুই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।"–সূরা আলে ইমরান : ৮৩

طَوْعًا ও كَرْهًا শব্দ দুটি সবকিছুকেই 'ইসলাম' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে। কারণ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত্য করছে এবং তাঁর ফরমান মেনে চলছে। সকল সৃষ্টি আল্লাহর নিকট বড় অসহায়। তাঁরই মুষ্টিবদ্ধ সমগ্র বিশ্ব। তাঁর ইচ্ছা ও হুকুমের বাইরে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় সকলেই তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে চলছে। তিনিই সকল শক্তির উৎস। চাঁদ-সুরুজ থেকে শুরু করে ছোট বড় সকল জিনিসের তিনিই প্রভূ-প্রতিপালক। কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়াই তিনি যেভাবে চান সবকিছু পরিচালনা করেন। সকলের সৃষ্টিকর্তা তিনি। সকলকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন। সকলকে দিয়েছেন আকার আকৃতি। এ জগতে তিনি ছাড়া আর যা আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর দাস, তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর নিকট সহায় সম্বলহীন। সকল ক্ষেত্রেই তারা তাঁর অধীন। তিনি এককভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও রূপকার। যদিও তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উপায় উপকরণের মাধ্যমেই করেছেন। এসব উপায় উপকরণও কিন্তু তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে এসব উপায়-উপকরণও কাজ করার ব্যাপারে একেবারেই স্বাধীন নয়। বরং এরা সর্বক্ষণ আল্লাহর হুকুমের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো উপকরণ উপাদানই তার ক্রিয়াকর্মে স্বনির্ভর নয়। বরং প্রতিটি উপকরণই আর একটি উপকরণের মুখাপেক্ষী। যার সাহায্য ছাড়া সে নিজের কাজ ও কাজের ফল প্রকাশ করতে পারে না। এ সহযোগিতা এবং উপায় অর্থাৎ কারণসমূহের কারণই হলো আল্লাহ তা'আলা। যিনি সকল উপায় উপকরণ ও কার্যকারণের স্রষ্টা, মুখাপেক্ষীহীন। সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক নেই। আর তাঁর সামনে দাঁড়াবার মতো তাঁর কোনো প্রতিপক্ষও নেই।

قُلْ اَفَرَءَ يْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ط قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ط عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○ - زمر : ٣٨

"(হে নবী!) এদের বলো, এটাই যখন প্রকৃত কথা তখন তোমরা কি মনে করো আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমাদের দেব-দেবীরা যাদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকছো আমাকে রক্ষা করতে পারবে ? কিংবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কি এরা সেই রহমতকে রুখে রাখতে পারবে ? হে নবী! বলে দাও, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর উপর নির্ভরশীলগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।"-সূরা আয্ যুমার ঃ ৩৮

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান আছে। এ সব আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে, প্রত্যেক কাজের কার্যকারণের মূল চাবিকাঠি আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির বিতর্ক ও ধমকের জবাবে এ অকাট্য সত্যকেই পেশ করে বলেছেন ঃ

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ط - الانعام : ٨١

"তোমরা যাকে (আল্লাহর) শরীক বানাচ্ছো তাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু যদি আমার রব কিছু চান তবে তা অবশ্যই হতে পারে।"

আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণাংগ নমুনা ইবরাহীম (আ)

আল্লাহর বান্দা হিসেবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পূর্ণ মর্যাদা ও উসওয়ায়ে কামালের অধিকারী। আল্লাহর গোটা যমীন শিরকের অন্ধকারে যখন ডুবে যাচ্ছিলো তখনই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাওহীদ, ইবাদাত ও ইখলাসের নূর নিয়ে সত্যের অনুসারী ও নিবেদিতদের ইমাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণাংগ নমুনা। সে ব্যাপারে আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ○ - البقرة : ١٢٤

"ইবরাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে জাতির নেতা বানাবো। ইবরাহীম বললো—আর আমার বংশের মধ্যে ? আল্লাহ্ বললেন, আমার ওয়াদা যালেমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।"
—সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪

লক্ষ্য করুন, এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় এ ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নেতৃত্বের এ ওয়াদা শুধু মু'মিন ও গোলামীর সীমারেখা মেনে চলা লোকদের জন্য। যালিমদের জন্য নয়। আর এটা জানাকথা যে, শিরকই হলো বড় যুলুম।

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ لقمن : ١٣

"প্রকৃত কথা এই যে, শিরক অতি বড় যুলুমের কাজ।"

ইবাদাতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কামিয়াব হবার জন্যই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নেতৃত্বের পদমর্যাদা লাভ করতে পেরেছিলেন। তাই আল্লাহর বন্দেগীর দৃষ্টান্তমূলক মানদণ্ড হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিলো। আর আল্লাহ তাঁর বংশধরদেরকে নবুওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামাত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছিলেন। তাঁর পরে যে নবীই প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁর বংশেই প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব স্বয়ং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছে।

اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ النحل : ١٢٣

"চারদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করো।"—সূরা আন নাহল ঃ ১২৩

আর এক জায়গায় ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা হেদায়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িকতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ البقرة : ١٣٥

"মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের মাঝেই আল্লাহর হেদায়াত নিহিত।"—সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শানে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

اِنْ اِبْرَاهِيْمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ـ رواه مسلم

"ইবরাহীম জগতের সর্বোত্তম ব্যক্তি।" এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার দরবার হতে তাঁকে খলিলুল্লাহ" আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো খিতাব হতে পারে না।

খুল্লাত শব্দের অর্থ

খুল্লাত শব্দ হতে খলীল শব্দ গঠিত হয়েছে, খলীল শব্দের আখ্যা হতে আর বড় কোনো আখ্যা নেই। একথার দলিল স্বয়ং "খলীল" ও "খুল্লাত" শব্দের মধ্যেই নিহিত। 'খুল্লাত' শব্দের অর্থই হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সীমাহীন ভালোবাসা। আর এ ভালোবাসা, গোলামী ও বন্দেগী করার পরিপূর্ণতার উপর নির্ভরশীল। বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ভালোবাসার উপরও তা নির্ভর করে। যে ভালোবাসা বান্দার জন্য আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে 'রব' মানা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আগেই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইবাদাত ও বন্দেগী হলো চরম সীমার বিনয় ও ভালোবাসার সমষ্টির নাম। এজন্য 'খুল্লাতের' মর্যাদা মহাব্বতের মানের চেয়ে অনেক উন্নত। আর এটাই সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদা যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত ও নেয়ামাত হিসেবে দান করেছেন। তাই তো এ দুনিয়ার কোনো মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'খলিল' ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اَهْلِ الاَرْضِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ ـ متفق عليه

"আমি যদি দুনিয়াবাসীদের কাউকে আমার খলিল বানাতাম, তাহলে আবু বকরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বানাতাম। কিন্তু আমি তো আল্লাহ তাআলার খলিল।"-বুখারী, মুসলিম

বুঝা গেলো মানুষ কোনো একজনেরই খালিল হতে পারে। খুল্লাত-এর মধ্যে কোনো অংশীদারীত্ব নেই। একজন কবি কতো সুন্দর বলেছেন ঃ

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوْحِ مِنِّيْ وَبِذَا اسْمِيْ الْخَلِيْلُ خَلِيْلاً ـ

"মোর সাথে প্রিয়তমা মিশে গেছে মোর জীবনের মতো
খলীলের নাম খলীল হলো মিশে যাবার কারণেই তো"

মহব্বত আর খুল্লাতের মধ্যে পার্থক্য

'মহব্বত' ও 'খুল্লাতের' মধ্যে পার্থক্য হলো 'খুল্লাত' হয়ে থাকে একান্ত এবং নির্ভেজাল আর মহব্বতের মধ্যে তা পাওয়া যায়। 'খুল্লাত' শুধু একজনের সাথেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহব্বত একের অধিক লোকের সাথে হতে পারে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে খুল্লাতের সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে আর অন্য কাউকে খলীল বানাতে অস্বীকার করে দিয়েছেন। আবার আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখা সত্ত্বেও অনেক মানুষের নিজের হাবীব (বন্ধু) বানিয়েছেন। যেমন তিনি হযরত ইমাম হাসান ও হযরত উসামা সম্পর্কে বলেছেন ঃ হে আমার আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাদের ভালোবাস। এভাবে নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি সবচেয়ে বড় মাহবুব হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহর রাসূলের কালামের পর আল্লাহর কালামের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। স্থানে স্থানে দেখতে পাবেন যে, "আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।" "আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।" "আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।" "আল্লাহ্ এমন লোকদের আনবেন যাদেরকে তিনি মাহবুব হিসেবে গণ্য করবেন এবং তারাও তাঁকে মাহবুব মনে করবে।" এসব কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একথা বুঝাতে চান যে, সত্যিকারের মু'মিন ব্যক্তি তিনি হবেন, যাকে আল্লাহ্ মহব্বত করেন আর তিনি আল্লাহকে মহব্বত করেন। অন্য এক জায়গায় বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে মহব্বত করে। একথা দ্বারা প্রমাণিত হলো, মু'মিন যদিও সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে কিন্তু অন্যদেরকেও মহব্বত করতে পারে। একথার অবশ্যম্ভাবী ফল এ দাঁড়ায় যে, মহব্বতে এককত্ব প্রয়োজন নেই কিন্তু 'খুল্লাত' এর বিপরীত। এতে একমুখীনতা অপরিহার্য।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

সাধারণভাবে এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব ছিলেন। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর খলীল। মনে করা হয়, মহব্বতের দরজা 'খুল্লাতে'র চেয়ে উঁচু। কিন্তু এ ধারণার পেছনে কোনো প্রমাণ নেই। সহীহ হাদীস দ্বারা একথা ভালোভাবে প্রমাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ তা'আলার খলীল

ছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই এ রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً-

"নিসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার খলীল বানিয়েছেন। যেমন তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর খলীল বানিয়েছিলেন।"

এভাবে আর একটি হাদীসও আগে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার খলীল। তাই এখন আমার আর কাউকে খলীল বানাবার অবকাশ নেই।

ঈমানের স্বাদ ও মজা

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মহব্বতে ইলাহী' অর্থ হলো ওই সব কাজ-কর্মকে পসন্দ করা হবে যা আল্লাহ পসন্দ করেন। শরীআতের দলীলের আলোকেই আমি 'মহব্বতে ইলাহীর' এ ব্যাখ্যা করেছি।

এ প্রসঙ্গে বুখারী, মুসলিমের উপরে উল্লেখিত হাদীসটির তাৎপর্যপূর্ণ শব্দমালার প্রতি লক্ষ্য করুন। সেখানে বলা হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। এভাবে কথা বলার কারণ হলো, মানুষ তখনই কোনো জিনিসের স্বাদ পায় যখন সে জিনিসের উপর হৃদয়ে অনুরাগ ও আর্কষণ বদ্ধমুল হয়। কোনো জিনিসের প্রতি যখন ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তখন সে জিনিস পেলে মনে এক প্রশান্তি তৃপ্তি ও পুলক শিহরণ জাগে। স্বাদ শব্দটি এমন একটি বিশেষ অবস্থার নাম যা রুচি সম্মত ও আকর্ষিত জিনিস অনুভব ও হাসিল করার পর মনে সৃষ্টি হয়। কোনো দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর মতে আকর্ষিক জিনিস ভোগ ও লাভ করার অপর নাম হলো স্বাদ। একথাটা এত ওযনহীন ও অমূলক কথা যে, এর প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন নেই। কারণ এ ভোগ ও লাভই তো হলো আকর্ষণ ও স্বাদের মধ্যমণি। শুধু স্বাদই স্বয়ং নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে খাবারের ব্যাপারটি নিন। খাবার মানুষের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক জিনিস। যখন সে খাবার খেয়ে ফেলে তখন এর স্বাদ অনুভব করে। তারপর একথা বলা কতটুকু ভুল যে, খাবার খাওয়াটাই হলো স্বাদ। এভাবে দৃষ্টিশক্তির কথা ধরুন। মানুষ কোনো প্রিয় জিনিস দেখার পর তার মনে একটা তৃপ্তি লাভ করে। তাই বুঝা গেলো যে,

তৃপ্তি লাভ হয় ওই প্রিয় জিনিস দেখার ও দৃষ্টিপাতের পর। এ কারণে নজর এক জিনিস আর স্বাদ ও তৃপ্তি আর এক জিনিস যা দেখার পরই সৃষ্টি হয়। কুরআনের শব্দাবলীও এ সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج - الزخرف : ٧١

"মন ভুলানো ও চোখের আস্বাদনের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে।"–সূরা আয যুখরুফ ঃ ৭১

এতে বুঝা গেলো শুধু দেখার নামই লয্যত (স্বাদ) নয় নতুবা এভাবে বলা হতো না যে, চোখ তাকে দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।

অন্যান্য অনুভূতি সম্পন্ন ব্যাপারগুলোরও এ একই অবস্থা । আনন্দ ও বিপদের যেসব অবস্থা আত্মা অনুভব করবে তা কোনো না কোনো পসন্দনীয় জিনিস অথবা অপসন্দনীয় জিনিস লাভের ও ভোগের অনুভূতিরই ফলাফল। স্বয়ং অনুভূতি ও উপলব্ধির ফল নয়। অতএব ঈমানের স্বাদ ও এর থেকে প্রাপ্ত মজা ও আনন্দ আল্লাহ তা'আলাকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসারই ফল। তিনটি কথা পুরোপুরিভাবে বুঝার পরই এ ফল লাভ হতে পারে।

এক ঃ এ ভালোবাসায় পরিপূর্ণতা থাকতে হবে।

দুই ঃ ভালোবাসা বাড়তে থাকতে হবে।

তিন ঃ এ ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধক এমন সবকিছুকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করতে হবে।

"ভালোবাসার পরিপূর্ণতার" অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পৃথিবীর সবকিছু হতে বেশী প্রিয় হবে। শুধু একথা বললেই হবে না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাস্তবেই সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে।

ভালোবাসা বৃদ্ধি হবার দাবী হলো, যদি বান্দা অন্য কাউকেও ভালোবাসে সে ভালোবাসাও আল্লাহর জন্য হতে হবে। মূল ভালোবাসা তার জন্যে হবে না—হবে আল্লাহর জন্য। তার প্রতি ভালোবাসা হবে আল্লাহর ভালোবাসা কেন্দ্রিক। ভালোবাসার পথের প্রতিবন্ধকজনিত প্রতিটি জিনিসকে ঘৃণা করার অর্থ হলো, ঈমানের বিপরীত জিনিস কুফর ও শিরককে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকেও অধিক অপসন্দ করা।

এসব কথা বুঝার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদেরকে ভালোবাসাও প্রকৃতপক্ষে

আল্লাহকে ভালোবাসার সমতুল্য। অর্থাৎ তার একটা অংশ। রাসূলের প্রতি মহব্বত এজন্য যে, রাসূল আল্লাহ্ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশী মহব্বত করতেন। এ কারণেই আল্লাহর প্রিয়দের প্রতি মহব্বত অবশ্যম্ভাবী। এখন 'মহব্বতের' বিপরীত 'খুল্লাতের" অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। কিভাবে এতে গায়রুল্লাহর জন্য এক কণাও কোনো অংশ নেই। মূলগতভাবেও নেই, আংশিকভাবেও নেই। বরং তা আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। এর দ্বারা 'মহব্বতের' চেয়ে 'খুল্লাতে'র শ্রেষ্ঠত্ব দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহর মহব্বতের ব্যাপারে চিন্তা ও আমলের ত্রুটি

মোটকথা আল্লাহর মহব্বত ও খুল্লাতের মধ্যেই 'ইবাদাতে ইলাহীর' প্রকৃত রহস্য লুকায়িত। কিন্তু কত জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন যারা এ সূত্র বুঝতে পারেননি। তাদের ধারণা ইবাদাত বন্দেগী তো শুধু বিনয় ও নিজকে ছোট জানার একটা নিরস অজিফা। এতে আবার মহব্বতের স্বাদ কোথায় ? কারণ মহব্বত তো হৃদয়ের একটি কামনা বাসনার মিলিতরূপ। আর দ্বিতীয় পক্ষের তরফ থেকে আনন্দ উল্লাস প্রকাশের নাম। একথা তো খুবই স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার জাত এ ধরনের কথাবার্তা হতে একেবারেই দূরে। এ জন্য এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে একজন 'মাহবুব' বা একজন 'মুহিব'-এর অবস্থান দেয়া যায়। এ ধারণাটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মহব্বতের সঠিক অর্থ না বুঝারই ফল। এ ধরনের ভুল বুঝার আশংকায় হযরত যুননূন মিসরী (র) তাঁর সামনে 'মহব্বতে ইলাহীর' উল্লেখ করা হলে বলেছিলেন ঃ

> "চুপ থাকো। এ ব্যাপারে কোনো কথা বলো না। তোমার একথা যেনো সাধারণ লোকদের কানে না যায়, তারা আল্লাহর মহব্বতের দাবী করতে শুরু করে।"

বস্তুত কিছু আলেম ওইসব লোকের সাথে উঠাবসা মাকরুহ বলে দিয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতির যিকির ও ধারণা দেয়া ছাড়া শুধু তার মহব্বতের কথাই বলে। এ ব্যাপারে একজন বুযুর্গের কথা হৃদয়ের মাঝে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত শুধু মহব্বতের সাথে করে সে হলো 'যিন্দিক' অর্থাৎ কাফির। আর যে ব্যক্তি শুধু আশা নিয়ে ইবাদাত করে সে 'মুরযি' আশাবাদী। আর যে ব্যক্তি শুধু ভয়ের সাথে ইবাদাত করে সে 'হারুরী"। তাওহীদবাদী মু'মিন

কেবল সে ব্যক্তি যে মহব্বত, ভয় ও আশা এ তিনটি জিনিসের সাথে ইবাদাত করে।"

পরবর্তীকালের সূফীদের মধ্যে এমন সব লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা মহব্বতের দাবীর ব্যাপারে নিজেদের সীমারেখা ভুলে গিয়ে সীমালংঘন করে বসেছিলো। এমন কি এদের মধ্যে এক রকমের অহংকার পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। তারা এমন দাবীও করে যা ইবাদাতের বিপরীত। তারা নিজেদের মধ্যে এমন সব খোদায়ী গুণের দাবী করে যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারো মধ্যে থাকতে পারে না। তারা নিজেদেরকে এমন মর্যাদাবান বলে প্রকাশ করে যা নবী-রাসূলদের মর্যাদার চেয়েও উপরে।

তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট এমন গুণাবলী দাবী করে, যেসব গুণাবলী শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এমন কি নবীগণও যার উপযুক্ত নয়।

এ হলো ওইসব বিপজ্জনক গোমরাহী যার শয়তানী জালে তরীকতের বড় বড় শেখগণও আটকা পড়েছে। তাদের এত বড় ভুলে নিমজ্জিত হবার কারণ তারা ইবাদাতের মর্ম বুঝতে পারেনি এবং ইবাদাতের হক আদায় করতে পারেনি। বরং এর কারণ সেই বিবেক বুদ্ধির ত্রুটি যা ছাড়া বান্দা নিজের পরিচয়ও জানতে পারে না। আসল বুদ্ধি যখন ভুল পথে চলে এবং দীনের জ্ঞান যখন পুরোপুরি লাভ হয় না, তখন যদি নফসের মধ্যে আল্লাহর মহব্বতের জযবা পয়দা হয়ে যায়, তখন তা মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখেন। কেননা আল্লাহ্ কোনো বান্দাহকে এতটুকুনই ভালোবাসেন যতটুকুন তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মনে করে মাহবুবে খোদা হবার পর কোনো গুনাহ্ই তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে মনে করে, "যেহেতু আমি সুঠামদেহী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তাই আমি যত বিষই পান করি না কেনো এবং অবিরত খেতে থাকি না কেনো এতে আমার কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি হবে না। বিবেক-বুদ্ধির এ শত্রুরা যদি কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতো এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনাদর্শ মনোনিবেশ সহকারে অবলোকন করতো যে, মানব জাতির এ সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণকেও কখনো কখনো আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে তাওবা অলক্ষ্যে অজান্তে আবার নিজ থেকেই বেরিয়ে যায়। তখন সে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে বসে। বস্তুত ভালোবাসার মধ্যে মানবীয় দুর্বলতার মুশাহিদা করা যায়। এরপর নফ্স যখন শয়তানের প্রতারণার স্বীকার হয়ে যায় তখন মুখ দিয়ে

বড় বড় বুলি বেরুতে থাকে। সে স্পষ্ট করে বলতে শুরু করে, আমি তো আল্লাহর আশেক। আমি যা চাইবো করবো। এতে আমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা যে সরাসরি গুমরাহী তা স্পষ্ট। আর ঠিক এ ধরনের কথাবার্তা ইহুদী নাসারাদের মুখ থেকে বের হতো। তারা বলতো ঃ

"আমরা আল্লাহর পুত্রের ও তাঁর খুবই মাহবুব"

একথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

তোমরা তো তাঁর পুত্রের মাহবুব হবার কথা দাবী করছো কিন্তু একথা কি বলতে পারো, তিনি কেন তোমাদেরকে আযাবের পর আযাব দিয়ে যাচ্ছেন ? "পুত্র আর প্রিয় হবার" এটা কি আলামত ? অতএব এ নফস হলো একটি বিপজ্জনক ধোঁকা। নতুবা প্রকৃত সত্য কথা হলো, যিনি আসলে আল্লাহর 'মাহবুব' হবেন তিনি তো তার নফ্সকে শুধু এমন কাজে লাগাবেন যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি উৎপাদনের কারণ হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে এমন কাজ তিনি কখনো করবেন না।

যে ব্যক্তি গুনাহ্ কবীরা করে, নাফরমানীর পর নাফরমানী করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার খারাপ আমলগুলোকে এমনভাবে ঘৃণা ও রাগত দৃষ্টিতে দেখেন, যেভাবে তিনি তার ভালো আমলগুলোকেও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেন। আল্লাহ্ তাআলার এ প্রিয় বান্দা নবী-রাসূলগণকে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী আত্মগঠনের জন্য বিভিন্ন বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে। তাহলেই তারা জানতে পারতো অনিষ্ট ও ক্ষতি করার ব্যাপারে গুনাহ্ হলো এমন ধারালো হাতিয়ার এবং নিজের লাভ আদায়ের ব্যাপারে এত নির্দয় নিষ্ঠুর প্রমাণিত যে আল্লাহর অনেক বড় বড় খাস বান্দাহকেও ছাড়েননি। আর এটা ঠিক প্রকৃতির দাবীও। স্বয়ং মানুষ মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কার্যকারিতা দেখতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তির আশেক যদি তার মাশুকের খেয়াল-খুশী রুচিমর্জি সম্পর্কে অবগত না হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ না করে বরং নিজের প্রেমের আবেগের ইশারার উপর নাচতে থাকে তাহলে অবশ্যই তার এ আচরণ মাশুকের তথা প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তিরই নয় বরং শত্রুতা ও মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্যবশত বেশ কিছুসংখ্যক আহলে সুলুক আল্লাহর ভালবাসার ধারণা দিতে গিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু ভুল কথাবার্তা বলেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের সীমারেখার পরওয়াও করেননি। আবার

কখনো আল্লাহর হকসমূহকে এড়িয়ে চলেছেন। আবার কখনো তা নির্দ্বিধায় বাতিল দাবীও করেছেন। একজন আহলে সুলুক বলেছেন ঃ

"আমার যে কোনো মুরিদ একজন ব্যক্তিকেও জাহান্নামে দিয়েছে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কেউ কেউ বলেছেন ঃ

"যে কোনো মুরীদ একজন মু'মিনকেও জাহান্নামে থাকতে দিয়েছে আমি তার উপর অসন্তুষ্ট।"

তৃতীয় একজনকে শুনানো হয়েছে ঃ

"কিয়ামতের দিন আমার খিমা বা তাবু স্থাপিত হবে জাহান্নামের দরজায়। যাতে একজন লোককেও জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেয়া না হয়।"

একথা ও এ ধরনের আরো অনেক কথা বিভিন্ন প্রখ্যাত প্রখ্যাত মাশায়েখরা বলেছেন বলে প্রচার আছে। এসব কথাবার্তা, এসব লোক সম্পর্কে হয় মিথ্যামিথ্যি প্রচার করা হচ্ছে, আর যদি সত্যি সত্যি এসব কথা তারা বলে থাকেন, তাহলে এসবই ভিত্তিহীন মিথ্যাকথা। এসব কথাবার্তা তারা সচেতন ভাবে বলেননি। বরং নেশাগ্রস্থ বেহুঁশ অবস্থার এসব কথাবার্তা। আর নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মানুষের হুঁশ থাকে না। অথবা এ অবস্থায় মানুষের বিবেচনা শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। কি বলছে না বলছে সে তা বুঝতে পারে না। এ কারণেই নেশাগ্রস্থ অবস্থা কেটে যাবার পর এদের অনেকেই এসব কথাবার্তার জন্যও ইস্তেগফার করেছেন। ঠিক এ ব্যাপারটি ওইসব সুফীদের মধ্যে কাজ করেছে, যারা প্রেমাস্পদের গুণাগুণ শুনার অবকাশ রেখেছেন।

মহব্বতের সঠিক মানদণ্ড

প্রেম ভালোবাসা পথের এ-ই হলো ওই বিপজ্জনক অবস্থা এসব অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রেম-ভালোবাসার একটি কষ্টিপাথর ঠিক করে দিয়েছেন। যাতে প্রেমের প্রত্যেক দাবীদার ব্যক্তি এর উপর ভিত্তি করে তাদের ভালোবাসার দাবীকে যাচাই করতে পারে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ ال عمران : ٣١

"বলো হে নবী! যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালো-বাসবেন।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

আল্লাহকে ভালোবাসার সত্যিকার দাবীদার ওই ব্যক্তিকে বলা যায়, যে ব্যক্তি রাসূলে করীমের অনুসরণ করাকে নিজের চলার পথ বানাবে। এ সত্য বুঝাবার জন্য কোনো অধ্যায় সংযোজনের প্রয়োজন নেই যে, রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণই ইবাদাতের আসল কথা।

কুরআন আরো এক কদম আগে বেড়ে হুব্বে ইলাহী ও হুব্বে রাসূলের এক উজ্জ্বল মানদণ্ড কায়েম করেছে। সে মানদণ্ড হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। জিহাদের হাকীকত হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম পালনে পরম সন্তুষ্টি এবং নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে চরম ঘৃণার সাথে পরিহার করে চলা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস মাহবুব বান্দাদের এবং যাদের নিকট আল্লাহ মাহবুব, তাদের ব্যাপারে একটি পার্থক্য সূচক বর্ণনা দিয়েছেন :

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"তারা মু'মিনদের জন্য খুবই সহৃদয় আর কাফেরদের উপর বজ্র কঠিন। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকে।"

–সূরা আল মায়েদা : ৫৪

এ কারণেই উম্মতের ভালোবাসা ও ইবাদাত বিগত দিনের উম্মতদের তুলনায় বেশী পরিপূর্ণ। আর এ উম্মতের ভিতরে রাসূলে করীমের সাহাবা এবং মানুষের তুলনায় আল্লাহর মহব্বত ও ইবাদাতে বেশী কামেল। অথবা যারা রাসূলুল্লাহর এসব সাহাবাদের সঠিক নমুনা বনে যাবে, যারা এদের যত বেশী অনুসরণ করবে, ভালবাসা ও ইবাদাত ততোটাই পরিপূর্ণ হবে।

আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের এ মানদণ্ড ও আমলী কাজ সামনে রেখে ওইসব লোকদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর প্রেমের ইজারাদার বলে মনে করে, অথচ দিনরাত রাসূলের সুন্নাত ও তাঁর হুকুম-আহকামের বিপরীত কাজ করে এবং এমন আকীদা ও ধ্যান-ধারণা পোষণ করে যা দীন ও শরীআতের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।

শরীআতের অনুসরণ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-ই হলো খাঁটি আল্লাহর প্রেমিক ও মিথ্যা প্রেমিকদের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড। এ পার্থক্য দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত প্রেমিক ও অলি এবং ভালোবাসার মৌখিক দাবীদারদের মধ্যে আসল পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। এ মৌখিক দাবীদারগণ মহব্বত করার দাবীর সাথে সাথে শরীআত বিরোধী কাজ ও

কথা এবং নিজেদের মনগড়া বেদআতের তাবেদারী করতে থাকে। অথবা তারা মহব্বতের এমন মনগড়া ব্যাখ্যা করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটা জিনিসকে মহব্বত করতে হবে। এমন কি কুফরী, ফাসেকী, নাফরমানীর মত জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে।

আসলে এটাই হলো মহব্বতের ওই বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি, যে মহব্বত ইহুদী নাসারা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। নাম সর্বস্ব ইসলামের সুফিদের মৌখিক এ মহব্বতের দাবীও ইহুদী নাসারাদের মহব্বতের দাবীর মতই। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর ছেলে ও তার প্রিয়। যদিও এ হিসেবে যে, এদের কুফরী, এদের কুফরীর সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে না। এদেরকে ইহুদী নাসারাদের সমান গুমরাহ বলা যেতে পারে না। কিন্তু যদি আর একটি দিক দিয়ে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এদের এ দাবী ইহুদী নাসারাদের দাবী হতেও নিকৃষ্টতম ও ধ্বংসকারী। কারণ এদের মধ্যে শরীআতের বিরোধিতার সাথে সাথে মুনাফিকীর জীবানুও বিদ্যমান। আর একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, মুনাফিকের ঠিকানা জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নস্তরে।

তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে আল্লাহর মহব্বতের যে তালিম দেয়া হয়েছে ঠিক সেই তালিম কুরআন মাজীদেও দেয়া হয়েছে। যদিও এসব কিতাবের শব্দাবলী ও ভাষা এবং আসল তালিমের ব্যাপারে তাদের অনুসারীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কিন্তু এরপরও এটা একটা অতি সত্য কথা, আল্লাহর মহব্বতের তালিম প্রকৃত অর্থে হেদায়াতে রাব্বানী হবার ব্যাপারে কারো মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। বরং এ শিক্ষা তাদের কাছে ইনজীলের শরীআতের সবচেয়ে বড় ও বুনিয়াদী শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত।

ইনজীল বলে ঃ "হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, মন-দিল, আকল-বুদ্ধি ও অন্তর দিয়ে খোদাওয়ান্দকে মহব্বত করো।"

আজও নাসারা সম্প্রদায় দাবী করছে, তারা হুব্বে ইলাহীর উপর কায়েম আছেই। আর তাদের মধ্যে যে তাকওয়া ও পরহেযগারী পাওয়া যায় তা সে ওসিয়তেরই প্রভাব। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যিকারের মহব্বত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যা পসন্দ করেন তা তারা করে না। বরং যে জিনিস আল্লাহর অপসন্দ ও যাতে অনন্তুষ্ট হন, তারা তা-ই করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি তাদের মোটেই পরওয়া নেই। এর ফলেই আল্লাহ

তা'আলা তাদের সকল আমল নষ্ট করে দিয়েছেন। একদিকে তারা তথাকথিত আল্লাহ প্রেমের নেশায় বেহুঁশ হয়ে আছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিদ্রোহী ও অভিশপ্তদের তালিকায় শামিল করে নিয়েছেন। আল্লাহর সুন্নাত হলো, তিনি কেবল সেইসব লোকদেরই ভালোবাসেন এবং অনুগ্রহ করেন যারা তাঁকে সত্যিকার মহব্বত করে। এটা কিভাবে হতে পারে যে, বান্দাহ যে আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহ তাকে ভালোবাসে না ? প্রকৃত ব্যাপার হলো বান্দাহ আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ততটুকুই ভালোবাসেন। আর এর ফল বান্দাহকে এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দিয়ে থাকেন। হাদীসে কুদসীতে আছে ঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - رواه البخارى و مسلم

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক বাহু এগিয়ে আসি। আর যে আমার দিকে এক বাহু এগিয়ে আসে আমি তার দিকে একগজ এগিয়ে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।"

কুরআনে একথাগুলো বার বার উচ্চারিত হয়েছে ঃ

"আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"
"অনুগ্রহকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।"
"তাওবাকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।"

শুধু তাই নয়, বরং কুরআন সুন্নাহর ভাষ্য অনুযায়ী তো আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকেই তাঁর প্রেমের সার্টিফিকেট দান করেন যারা ফরয, ওয়াযিব আদায় করে, নফল বন্দেগী বেশী বেশী পালন করে।

একটি বিখ্যাত হাদীসে কুদসীতে আছে ঃ

لاَيَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهٖ - رواه البخارى

"নফল বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দাহ আমার নিকটবর্তী হয়। এভাবে সে আমার প্রিয় হয়ে উঠে। এমনকি এক সময় আসে যখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে ; আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে।"

দুনিয়া বিরাগীদের ভুল ধারণা

আল্লাহ প্রেমের এ সঠিক দৃষ্টিভংগির আলোকে দেখলে দেখতে পাবেন, এই তথাকথিত আল্লাহ প্রেমিকরা অনেক ক্ষেত্রেই শরীআতের বিরোধিতা করে থাকে। আল্লাহর রাহে চেষ্টা-প্রচেষ্টা তথা জিহাদ চালাবার ধারণা পর্যন্ত পোষণ করে না। শরীআত এবং জিহাদ ত্যাগ করার পরও তারা আল্লাহর মহব্বতের বড় দাবীদার। আবার কেউ এমন খামখেয়ালী করেন যেমন খামখেয়ালী করেছে নাসারা জাতি। এরা এদের এসব চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সমর্থনে এমন উদ্ভট কথা ও যুক্তি পেশ করে, যেসব যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতো নাসারা জাতি। অর্থাৎ তারা হয় কুরআন ও হাদীসের মুতাশাবেহ শব্দাবলীর মনগড়া ব্যাখ্যা করতো, অথবা এমন গল্প কাহিনীর উপরে তাদের দলীলের ভিত্তি রচনা করতো যাদের এসব গল্প-কাহিনী সত্য হবার ব্যাপারে কোনো প্রমাণাদি ছিলো না। যদি ভালো ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সততা ও নিষ্ঠার উপর বিশ্বাসস্থাপন করাও যায় তাহলেও এসত্য অস্বীকার করতে পারা যাবে না যে, তারা মাসুম ছিলো না। এরপরও তারা তাদের কথা মেনে নেয়াকে ওহীর মতো ফরয বলে মনে করতো। এর অর্থই হলো, যেভাবে নাসারা জাতি তাদের ওলামা মাশায়েখকে প্রকৃতপক্ষে দীনের প্রণেতার (শারেয়) মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলো। এ লোকরাও তাদের মুরশিদ ও পীর-মাশায়েখকে আসলে শরীআতের আমীর মনে করতো। এ ব্যাপারে অবস্থা কখনো এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছতো, এসব ইবাদাত ও গোলামীর শিকড়ের উপর দিয়ে সরাসরি করাত চালিয়ে দিয়ে দাবী করতে শুরু করে যে, খাস লোকেরা বন্দেগীর সীমারেখা পার হয়ে যায়। যেমন ঈসায়ী সম্প্রদায় ঈসা মাসীহ-এর ব্যাপারে দাবী করে আসছিলো অথচ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর গোলামীর প্রকৃত ও বাস্তব প্রকাশের নামই হলো দীন এবং আল্লাহ জাল্লাশানুহুর চরম ও সার্বজনীন মহব্বতকেই দীন বলে। একটি জিনিসের কমতি অপর জিনিসের কমতির অকাট্য প্রমাণ। এভাবে গায়রুল্লাহর মহব্বত গায়রুল্লাহর গোলামীরই প্রমাণ। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ওইসব জিনিস পসন্দ করেন যেসব জিনিস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব যে আমল আল্লাহর জন্য হবে না তা পরিত্যাজ্য।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الخ

"কাজের কর্মফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

যে কাজ উস্ওয়ায়ে রাসূলের মুতাবিক হবে না তাও পরিত্যাজ্য।

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ـ رواه احمد و مسلم

"যে ব্যক্তি আমার হুকুমের বাইরে কোনো কাজ করবে, সে কাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।"

এটাই দীন ইসলামের মূল বুনিয়াদ। আসমানী কিতাব নাযিল হবার এটাই ছিলো উদ্দেশ্য। আর আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠাবারও লক্ষ্য ছিলো এটাই। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পয়গামই শুনিয়েছেন। আর এ জন্যই তিনি তার শারীরিক ও মানসিক সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

শিরকের বিপদ

গোলামীর এ স্তরে পৌঁছার ব্যাপারে মানুষের নফ্সের কিছু কিছু বড় দুর্বলতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ দুর্বলতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় বুনিয়াদই হলো শিরকের প্রতি আকর্ষণ। শিরক মানুষের নফ্সের এক বড় দুষ্ট ক্ষত। এমন কি এ উম্মতের মধ্যেও শিরকের অদৃশ্য জীবাণু পাওয়া যায় যে, উম্মাত তাওহীদের পতাকাবাহী। স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এর ইংগিত দিয়েছেন। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম সবসময়ে এ বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য যিকির-ফিকির করতে থাকতেন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আপনি যে বলছেন 'শিরকের প্রতি আকর্ষণ পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজ থেকেও গোপনে হয়ে থাকে'। তাহলে এ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচার উপায় কি ? একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন। এসো ! শিরকের ছোট বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদেরকে আমি ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَالاَ اَعْلَمُ ـ

"হে আল্লাহ ! জেনে শুনে কখনো আমি কাউকে তোমার শরীক করা হতে তোমার নিকট পানাহ্ চাই। আর আমি অজান্তে কোনো শরীক করে ফেললে তার থেকেও তোমার মাগফিরাত কামনা করছি।"

রাসূল (স) দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلاَ تَجْعَلْ لاَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا ـ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিটি কাজকে শুধু তোমার জন্যই একনিষ্ঠ বানাও। এতে অন্য কারো যেনো কোনো অংশ না থাকে।"

শান ও সম্পদের ভালোবাসা

গোলামীর পথে দ্বিতীয় বাধা হলো ধন-সম্পদের আকর্ষণ। আমিত্বের অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে সাধারণত এমন এমন গোপন প্রত্যাশা লুক্কায়িত থাকে যা আল্লাহর সত্যিকারের ভালোবাসা, বন্দেগী ও ইখলাসের বীজের উপর আবরণ ফেলে দেয়, যাতে তা বাড়তে ও অগ্রসর হতে না পারে। শাদ্দাদ ইবনে আউস (র) আহলে আরবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

"হে আরববাসী ! তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ভয় যে বিষয়ে তা হলো তোমাদের 'রিয়া' ও 'নফ্সের গোপন লালসা'।"

স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের সর্বোচ্চ হন্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত শব্দগুলো দিয়ে সাবধান করেছেন ঃ

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِيْ زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حَرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ لِشَرَفِ دِيْنِهِ ـ رواه احمد وترمذى

"দুটি ভুখা চিতাকে বকরীর পালে ছেড়ে দেয়া হলেও বকরীদের জন্য তা এত ধ্বংসাত্মক নয়, যত বড় ধ্বংসাত্মক ধন-সম্পদের লোভী মানুষ দীন ও ঈমানের জন্য।"–আহমাদ, তিরমিযি

বুঝা গেলো, যে অন্তরে সত্য ও খাঁটি দীন স্থান পাবে, সে অন্তরে ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের স্থান নেই। কারণ মানুষের মন যখন আল্লাহর ভালোবাসা ও ইবাদাতের আসল মজা পায় তখন তার দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় মজাদার জিনিস আর কিছু থাকে না। তখন অন্য কোনো দিকে যাবার তার কোনো প্রয়োজনও পড়ে না। এ কারণেই সরলমতি মু'মিনরা সকল প্রকার খারাপ কাজ ও কথা থেকে এর সাহায্যে মাহফুয থাকে। কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

"এরূপ ঘটল, যাতে করে আমরা ইউসুফের থেকে অন্যায়, পাপ ও নির্লজ্জতা দূরীভূত করে দেই। আসলে সে আমার বাছাই করা বান্দাদের একজন।"—সূরা ইউসুফ ঃ ২৪

এর কারণ একেবারেই স্পষ্ট। খালিস বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহর ইবাদাতের এমন মজা ও স্বাদ পায় যা গায়রুল্লাহর বন্দেগী হতে তাকে ফিরিয়ে রাখে। কারণ তার হৃদয়ে ঈমানের চেয়ে বেশী প্রিয়, সুস্বাদু, আনন্দদায়ক ও সম্মোহনের অধিকারী আর কোনো জিনিস নেই। আর এই বাতিনী অবস্থা আল্লাহর দিকে তার হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায়। সবসময়ই তাঁর দিকে মাথা নত রাখে। তাঁর যিকিরে হৃদয়কে মগ্ন রাখে। তাঁর ভয়ে বান্দা ভীত-প্রকম্পিত এবং রহমতের প্রত্যাশী থাকে। আল্লাহ এরশাদ করছেন—

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ○ ق : ٣٣

"যে ব্যক্তি গায়েবিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাঁর দরবারে নৈকট্যের আবেগাপ্লুত হৃদয় নিয়ে হাজির হয়।"
—সূরা কাফ ঃ ৩৩

ভালোবাসার প্রাকৃতিক দাবীই হলো, প্রেমিক যদি একদিকে প্রেমাস্পদের মিলনের আশায় আন্দোলিত থাকে তাহলে সাথে সাথে আবার না পাবার হতাশার দুর্ভোগে ভুগতে থাকে। এ কারণেই আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেমিক সবসময়ই আশা-নিরাশার দ্বিগুণ ভাবাবেগ পোষণ করে ঃ

يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ط - بنى اسرائيل : ٥٧

"তারা হয়ে থাকে তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত।"—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৭

কুরআনের এ শব্দগুলো এ সত্যেরই আয়না। মানুষের নফ্স মূলত দুটি অবস্থার যে কোনো একটিতে নিমজ্জিত থাকে। হয় সে এক আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ ও দাস হবে অথবা মাখলুকের বান্দা হয়ে থাকবে। আর বিভিন্ন রকমের শয়তান তার দিল ও দেমাগের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখবে। এছাড়া তৃতীয় আর কোনো সুরত নেই। কারণ মানুষের হৃদয় যদি গায়রুল্লাহ হতে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর জন্য পাগলপারা না হয়ে যায় তাহলে শিরকের নাজাসাতের সাথে তার মিশে যাওয়া এক নিশ্চিত

ব্যাপার। কুরআন মাজীদ যে ঈমানের দাবী করে তার মর্ম এর থেকে একটুও ভিন্ন নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط .... ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ الروم : ٣٠-٣١

"অতএব তোমরা একাগ্রচিত্তে তোমাদের চেহারা আল্লাহর দীনের দিকে ফিরিয়ে দাও ...... এটাই সোজা সুদৃঢ় দীন। কিন্তু এ সম্পর্কে অনেক লোকই জানে না। তার প্রতি অবনত হয়ে তাকে ভয় কর। আর নামায কায়েম করো। মুশরিকদের মধ্যে পরিগণিত হয়ো না।"
–সূরা আর রূম ঃ ৩০-৩১

গোটা মানবজাতি এ দুভাগেই বিভক্ত

এক শ্রেণী হলো আল্লাহর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বান্দাহর দল। যারা আল্লাহর মহব্বত, বন্দেগী ও আনুগত্যের নির্ভেজাল পথের অনুসারী।

আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো মুশরিকের দল। এ দল নফ্সের খাহেশের পূজারী। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও আলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্রথম দলের ইমাম বানিয়েছেন। যেভাবে তিনি ফিরআউন ও আলে ফিরআউনকে দ্বিতীয় দলের নেতা বানিয়েছেন।

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا - الانبياء : ٧٢-٧٣

"আমি ইবরাহীমকে বখশিশ হিসেবে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেককে আমি সালেহ এবং ঈমানদার বানিয়েছি। তারা আমার হুকুম অনুসারে মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখাতো।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭২-৭৩

এভাবে ফিরআউন ও আলে ফিরআউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج - قصص : ٤١

"আর আমি তাদেরকে গোমরাহীর নেতা বানিয়েছি। তারা মানুষকে জাহান্নামের পথে ডেকে আনতো।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৪১

ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদের ফিতনা

এ ধরনের ফিরআউনী গুমরাহী উৎস সম্পর্কে তাদের এ ধারণা যে, আল্লাহ তা'আলার রেযা ও কাযা এবং মর্যী ও মাশিয়ত দুটো একই জিনিস। আর এদের পরিণতিও এ নির্ভেজাল কুফরী ধারণার উপর গিয়ে ঠেকে যে খালিক ও মাখলূক উভয়টা একই জিনিস। যিনি খালিক তিনিই মাখলূক আর যিনি মাখলূক তিনিই খালিক। তাদের জিদ হলো, মাখলূকও খালিকের সমতুল্য। অথচ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘোষণা হলো ঃ

اَفَرَءَ يْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّلِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ○- الشعراء : ٧٥-٧٧

"তোমরা কি দেখেছ যে, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব জিনিসকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তা সবই পরওয়ারদিগারে আলম ছাড়া, আমার দুশমন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ৭৫-৭৭

আমি আগেই বলেছি যে, কিছুসংখ্যক মাশায়েখের সন্দেহপূর্ণ কথা-বার্তার ভিত্তিতেই এ মতের সৃষ্টি হয়েছে। এ হতভাগ্যরা এ ধরনের বক্র-চিন্তা ও দুর্বল ব্যাখ্যার এই রোগে নিমজ্জিত হয়েছে যার শিকারে পরিণত হয়েছিল নাসারা জাতি।

ফানাহ

এসব সন্দেহপূর্ণ শব্দাবলীর মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ফানাহ' শব্দটি দেখা যাক। তাদের এ একটি শব্দের আড়ালে কেমন বিপজ্জনক এবং আপদমস্তক শিরক ও নাস্তিকতা লুকিয়ে আছে।

'ফানাহ' তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, কামেল লোকদের ফানাহ। এতে আম্বিয়া ও অলীগণ শামিল রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার 'ফানাহ'র কাসেদীনের এতে সালেহীন ও কম মর্যাদার অলীগণ।

তৃতীয় প্রকার 'ফানাহ' হলো মুনাফিক ও মুশরিকদের।

প্রথম শ্রেণীর 'ফানাহ' হাকীকত হলো, আবেদের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর সাথেই ভালোবাসা জুড়ে নিতে হবে। তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। ভরসা করতে হবে তাঁরই উপর। তাঁর কাছেই চাইতে হবে সকল রকম সাহায্য-সহযোগিতা। বন্দেগীর পরিপূর্ণতার লক্ষণই হলো বান্দাহ তাই পসন্দ করবে যা আল্লাহ পসন্দ করেন। তাকেই ভালোবাসবে যিনি আল্লাহর নিকট মাহবুব হবেন। যেমন ফেরেশতা, আম্বিয়া ও সুলাহা। যাদের মনের অবস্থা হবে কুরআনে বর্ণিত অবস্থার মত 'কালবে সালীম'। সালীম অর্থ হলো সুরক্ষিত। এজন্য কালবে সালীম হলো সেই কালব, যে কালব আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অথবা আল্লাহর মহব্বত ছাড়া অন্য সকলের মহব্বত থেকে পূত-পবিত্র ও সুরক্ষিত থাকবে। আল্লাহর ভালোবাসা ও বন্দেগীর এ অবস্থাকে আপনি 'ফানাহ' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন অথবা অন্য কোনো শব্দ দ্বারা আমি এ নিয়ে আর বহস্ করবো না। অবশ্য কথা হলো প্রকৃত ইসলাম এটাই।

দ্বিতীয় প্রকার 'ফানাহ' হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো খেয়াল ও মুশাহিদা হতে হৃদয় একেবারেই পবিত্র থাকবে। অধিকাংশ 'সালেক'ই এ অবস্থায়ই থাকে। এর কারণ হলো এরা গোপনভাবে আল্লাহর মহব্বত, ইবাদাত, ও তাঁর যিকিরের দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে থাকে। এদিকে মনের দিক থেকে যেহেতু সে দুর্বল থাকে এজন্য জালাল ও জামালে খোদাওয়ান্দির ব্যাপারে ভীত ও পেরেশান থাকে। এদের এমন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না যে, আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখতে পারে। এর ফল দাঁড়ায় যে, গায়রুল্লাহ তাদের মনে আদপেই প্রবেশ করতে পারে না। বরং তারা গায়রুল্লাহর অনুভূতি পর্যন্ত ভুলে যায়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনের অবস্থা এমনই ছিলো, তিনি যখন তাঁর ছেলেকে আল্লাহর হুকুমে দরিয়ার ঢেউয়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ط- القصص : ١٠

"মূসার মায়ের হৃদয় খালি হয়ে গিয়েছিলো।"

–সূরা আল কাসাস ঃ ১০

"খালি হয়ে গিয়েছিলো" অর্থাৎ মূসার যিকির-ফিকির ছাড়া তার মনে আর অন্য কোনো কথা ছিলো না, এ হৃদয়ে শুধু মূসা আর মূসাই অবশিষ্ট

রয়েছে। এ ধরনের অবস্থা সাধারণত এমন ব্যক্তির উপর আপতিত হয় যার উপর মহব্বত অথবা ভয় ও আশার অসাধারণ জযবা হঠাৎ করে কব্জা করে নেয়। যে জিনিসকে তারা ভালোবাসে অথবা ভয় করে অথবা প্রত্যাশা করে থাকে, তার মনে ওইসব জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের ধারণা রাস্তা খুঁজে পায় না। অতএব যিক্‌রে ইলাহীর মধ্যে এ অবস্থা পেশ হওয়া একটি বাস্তব ঘটনা। যখন কোনো যিকিরকারী এ অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন তার ভেতর থেকে 'আমি', 'তুমির' পার্থক্য উঠে যায়। সে তার প্রিয়কে পেয়ে স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায়। সে নিজে যা দেখতে পায় তার মধ্যে মিশে গিয়ে নিজেকেই ভুলে বসে। তার অন্তরদৃষ্টি শুধু একটি যাতে আজালী ও হাকীকী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকেই বিদ্যমান দেখতে পায়। আর অবশিষ্ট গোটা বিশ্ব তার কাছে কোনো জিনিস বলেই মন হয় না। এ অবস্থা তীব্র হলে সালেকের মন এত দুর্বল হয়ে যায় যে, সে 'আমি' আর 'তুমি'র মধ্যে পার্থক্য করতে হয়রান হয়ে যায়। তখন তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সে নিজেই নিজের মাহবুব।

এটা হলো ওই অবস্থা—যার হাকীকত বুঝতে গিয়ে কত জাতি নিজকে গুমরাহীর অতল তলে নিক্ষেপ করেছে। এ অবস্থাকে তারা 'ইত্তেহাদ' (মিল) বুঝে নিয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো ওই মোকাম যেখানে পৌঁছে আশেক তার মাহবুব আল্লাহ তা'আলার সাথে মিশে যায়। এরপর এ দুটি অস্তিত্বের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য, কোনো লজ্জা, কোনো দ্বিত্ব অবশিষ্ট থাকে না। বরং দুটো মিলে এক অস্তিত্বে একাকার হয়ে যায়। এ এক স্পষ্ট ভ্রান্ত ও জাহেলী কথা। কেননা খালিকের সাথে কোনো জিনিসই এক হয়ে যেতে পারে না। আর খালিক কেন ? দুনিয়ায় কোনো জিনিসই কোনো জিনিসের মধ্যে মিলে যেতে পারে না। যদি কোনো জিনিস অপর কোনো জিনিসের সাথে এক হয়ে যেতে পারে তাহলে তা শুধু ওইরূপ যে অবস্থায় উভয়ই আপন আপন অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে অথবা এ দুটোর মিলনে একটা তৃতীয় জিনিস সৃষ্টি হয়ে যাবে যা এ দুটোর প্রত্যেকটা থেকে ভিন্ন অবস্থার অধিকারী হবে। যেমন পানি আর দুধ অথবা পানি ও শরাব মিলে একটি তৃতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়। এরপর না একে পানি বলা যায় আর না বলা যায় শরাব। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার জাতে পাকের ব্যাপারে এসব অবস্থার কোনোটিই ধারণা করা যায় না। অতএব তার ও তার প্রিয়ের এক হয়ে যাওয়া একটি ভ্রান্ত কথা। হাঁ, এ দুটোর উদ্দেশ্য ও মর্জির মধ্যে একমত হওয়া যেতে

পারে। তাদের পসন্দ অপসন্দের মধ্যে মিল হতে পারে। হতে পারে যা প্রেমিকের ভাল লাগে তা প্রিয়েরও ভালো লাগে। যা প্রিয়ের কাছে খারাপ লাগে তা প্রেমিকের কাছেও খারাপ লাগে। এক বন্ধু যা ভালোবাসে হতে পারে আরেক বন্ধুও তা ভালোবাসে। বন্ধু যাকে শত্রু মনে করে, তার বন্ধুও তাকে শত্রু ভাবে। আর এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে এবং শুধু এখানেই ইত্তেহাদ (মিল) হতে পারে।

'ফানাহ'র ধারণার মধ্যে রয়েছে এরূপ অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি। কামেল ওলীরা যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য আকাবের মোহাজির ও আনসারদের কেউ ফানাহ্র এ অর্থ মনে করতেন না। আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ আর কি করবো। এসব জিনিস সাহাবায়ে কেরামের পর দুনিয়ায় এসেছে। কেননা মনের দুর্বলতা থেকেই এ সবের সৃষ্টি হয়। আর সাহাবায়ে কেরামের দিল ঈমানের বোঝা বহন করতে এত শক্তিশালী, এত মযবুত, দৃঢ় ও এত সমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, কোনো অবস্থাতেই তাদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়তো না। এদের উপর না কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখা দিত, না তারা নেশাগ্রস্ত হতো। তাদের উপর কোনো সময় ইশকের হয়রানী বিস্তার লাভ করতো না। আর না তারা কোনো সময় অসচেতন থাকতেন। বসরার তাবেয়ীদের থেকে এ অবস্থার শুরু হয়েছিলো। সর্বপ্রথম দেখা গেলো যে, কিছু লোক কুরআন শুনে এর ধার সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে গেলো। এমন কি কারো রূহ এ অবস্থায়ই উড়ে চলে গেলো। যেমন আবু যেহির ও কাযী যাররাহ বিন আওফা।

অতপর এ ধারা সামনে অগ্রসর হলে আকাবেরে সুফিয়াদের বেশ কিছু সংখ্যককে 'ফানা' ও 'নেশা'র এ অবস্থায় লিপ্ত হতে দেখা গেলো। এ অবস্থায় তাদের পার্থক্যসূচক বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো। এমন কি এ বেহুঁশের জগতে থেকে তারা এমনসব কথাবার্তা বলে গেলো যেসব কথার ভ্রান্তি তারা হুঁশ ফিরে আসার পর নিজেরাই স্বীকার করলো। যেমন আবু যায়েদ (র), আবুল হাসান (র) ও আবু বকর শিবলী (র) ইত্যাদি বুযুর্গদের ব্যাপারে এরূপ কথিত আছে।

এদের বিপরীতে হযরত আবু সালমান দারানী (র), মারুফে কারখী (র), ফুযাইল বিন আয়ায (র) এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) ইত্যাদি বুযুর্গগণ, যাদের দিল ছিলো অত্যন্ত মযবুত। এসব বুযুর্গদের জ্ঞান-গরিমা কোনো সময়ই লোপ পেতো না তারা কখনো ওই অবস্থায় নিপতিত হননি। আর এ অবস্থায়ই মহব্বত ও ইবাদাতের সত্যিকারের কামালিয়াত।

যারা এ নিয়ামাতে কামালের দ্বারা আলোকিত হয়েছেন, তাদের দৃষ্টি কখনো আল্লাহর মহব্বত, ইবাদাত এবং অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না। কিন্তু সাথে সাথে তারা সবসময় এমন জ্ঞান ও পার্থক্যসূচক মেধা বহন করে থাকেন যা তাদের সব কাজ ও সব ব্যাপারের গভীরে প্রকৃত অবস্থায় দেখতে পায়। তারা তাদের দূরদর্শিতার দৃষ্টি দিয়ে দেখেন যে, সমগ্র জগতটা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কায়েম আছে এবং তাঁর মর্যি মুতাবিক সমগ্র মুয়ামালাত পরিচালিত হয়ে থাকে। অতপর এর চেয়েও আগে বেড়ে তাদের সামনে সবসময় প্রকৃতির এ রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে যে, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ জাল্লাশানুহুর সামনে মাথা নত ও তাঁরই তাসবিহতে মশগুল থাকে। এ দৃশ্যপট তাদের জন্য অত্যন্ত বড় শিক্ষা গ্রহণের কারণ হয়। আর তাদের দীনী ইখলাস ও বন্দেগীর আবেগ উচ্ছ্বাসের পার্থক্য সূচিত ও কষ্টিপাথরের কাজ করে।

কুরআন যে ইবাদাতের আহবান জানায় এটাই হলো সে ইবাদাত। সত্যবাদী মু'মিনে কামেল আরেফরা যাদের মাথার তাজ হলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। শবে মেরাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসমানে তাশরিফ নিয়েছিলেন সেখানে তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন। সেখানে তাদের আবদ ও মাবুদের মধ্যে যেসব গোপন কথাবার্তা হয়েছিলো তা অন্যদের বোধগম্য হবার নয়। আল্লাহর নৈকট্যের এ মর্যাদা লাভ করা আর কারো ভাগ্যে হয়নি। কিন্তু এত নিকটে যাবার পরও তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাঁর উপর না কোনো আত্মভোলার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো আর না তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছিলো। এটা ছিলো হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একেবারেই বিপরীত অবস্থা। হযরত মূসা "তূর" পাহাড়ের উপর তাজাল্লির ছায়া দেখার ধকল সইতে পারেননি। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

'ফানাহ'র তৃতীয় ধরন হলো, আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া আর কাউকে মওজুদ দেখতে পারে না। খালিকের ওজুদই অবিকল মাখলুকের মধ্যে দেখতে পাবে। আবদ ও মাবুদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। 'ফানাহ'র এ শ্রেণী ওই সব গোমরাহ ও মুলহিদদের অবলম্বন করা পথ যা 'হুলুল' ও 'ইত্তেহাদে'র গোমরাহীর বর্জের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়েছে।

কামিল শাইখের সঠিক ব্যাখ্যা

হক ও মারেফাতের বুযুর্গগণ যে বাক্যগুলো বলেছেন যেমন ঃ

مَا اَرٰى غَيْرَ اللّٰهِ۔

"আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কিছু দেখি না।"

অথবা

لَا اَنْظُرُ اِلٰى غَيْرِ اللّٰهِ۔

"আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেই না" ইত্যাদি।

তাদের এসব কথাবার্তার অর্থ হলো, "আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিশ্ব চরাচরের পরওয়ারদিগার অথবা খালিক অথবা পরিচালক অথবা ইলাহ দেখি না" এবং "আমি কোনো গায়রুল্লাহর থেকে মহব্বত ও ভালোবাসা অথবা আশা পোষণ করি না।"(এদের এসব দাবীর যুক্তিগুলো স্পষ্ট) মানুষের দৃষ্টি ওই জিনিসের দিকেই পতিত হয় যা তার মনে রেখাপাত করে। যার সাথে তার মহব্বত আছে অথবা যাকে তিনি ভয় করেন। নতুবা যে জিনিসের সাথে তার না কোনো ভালোবাসা আছে, না আছে কোনো শত্রুতা, না আছে কোনো লোভ, আর না আছে কোনো ভয়, এমন ধরনের জিনিসের প্রতি তার কখনো দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না। আর কখনো যদি তার দৃষ্টি ঘটনাক্রমে ওই দিকে পড়েও যায় তবে তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন পথ চলতে চলতে কারো দৃষ্টি কংকর কি পাথরের উপর পড়ে যায়। অতএব যারা সত্যিকারের বুযুর্গানে দীন তাদের নিকট এটা একটা সত্যিকারের ব্যাপার। তাও আবার প্রশংসার যোগ্য। উপরে উল্লেখিত কথার এটাই হলো তাদের আসল দাবী। তারা এ বাক্যগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও ইখলাসে পরিপূর্ণ এবং নিরেট সত্য কথার ঘোষণা করেছেন যে, বান্দাহকে গায়রুল্লাহর দিকে দৃষ্টি না দেয়া উচিত। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে ভালোবাসা, ভয় অথবা আরজুর দৃষ্টি দেয়া ঠিক নয়। এর বিপরীতে তার মন মাখলুকাতের সকল যিকির ফিকির থেকে খালি ও মুক্ত হওয়া উচিত। আর যখনই সে এগুলোর দিকে তাকাবে তখন আল্লাহ প্রদত্ত নূরের চোখে তাকাবে। হকের কান দিয়ে শুনবে, হকের চোখ দিয়ে দেখবে, হকের হাত দিয়ে ধরবে, হকের পা দিয়ে চলবে। ঐ জিনিসকে ভালোবাসবে যেসব জিনিস আল্লাহ ভালোবাসেন। ওইসব কথাবার্তাকে ঘৃণা করবে, যেসব কথাবার্তা আল্লাহ ঘৃণা করেন। এ দুনিয়ার কাজে কারবারে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গোটা মাখলুকাতের বিরোধিতা এবং শত্রুতাকেও পরওয়া করবে না। এটাই হলো ওই দিল যা 'সলীম' এবং 'একনিষ্ঠ' যাকে আরেফ ও মুওয়াহেদ বলা হয়েছে। যার উপাধি মু'মিন মুসলিম হিসেবে শোভা পায়। যেমনভাবে

'ফানাহ্‌র' তৃতীয় প্রকারটি অর্থাৎ ফানা ফিল ওয়াজুদ ফিরআউন ও তার অনুসারীর বৈশিষ্ট্য, তেমনি এ প্রকারটি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তগত।

ফানাহ্‌র এ প্রকারটাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রশংসনীয়। যত সত্যপন্থী এবং অনুসরণের যোগ্য মাশায়েখ অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এ ধারণা ও আকীদা পোষণ করতেন যে, তিনি সকল মাখলুক থেকে একেবারেই পৃথক অস্তিত্ব। তিনি চিরন্তন, আর অবশিষ্ট সব সৃষ্টি ধ্বংসশীল। আর চিরন্তন সত্তা ধ্বংসশীল বস্তু থেকে পৃথক ও একেবারেই স্পষ্ট হওয়া একটি জরুরী ব্যাপার। এসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ রাহে সুলুকে সংঘটিত হওয়া সন্দেহ হৃদয়ের রোগসমূহ সম্পর্কেও লোকদেরকে অবহিত করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে, কিছু কিছু লোক সুলূকে বাতেনের সময় তো মাখলুকাতের মুশাহিদা করেন কিন্তু হৃদয়ে পার্থক্য করার শক্তি না থাকার কারণে মাখলুককেও খালিক বলে মনে করে বসে। ঠিক যেমন কোনো ব্যক্তি সূর্যের কিরণ দেখে ধারণা করে বসে, এটাই সূর্য। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়।

বিরহ মিলন

(এটি তাসাউফের একটি পরিভাষা। ব্যক্তির দৃষ্টি ও অন্তরের অবস্থা পরস্পর বিপরীত দিকে থাকলে 'ফরক' আর দুটি জিনিস একটি একক বিন্দুতে একিভূত হলে তাকে বলা হয় 'জমা'।)

"ফানাহ্‌র পরিভাষার সাথে মিলে যায় এমন দুটো শব্দ ফরক ও জমা।" আর এতেও এমন ধরনের বিপজ্জনক ইবাদাতের রেওয়াজ এবং ধারণা ঢুকে আছে যা 'ফানাহ্‌র' পরিভাষার আবরণে লুক্কায়িত। একজন বান্দাহ যখন মাখলুকাতের বিভিন্ন রকমের জিনিস আধিক্যের উপর নজর দেয় তখন তার দৃষ্টি ও তার হৃদয় উভয়টাই এতে পেরেশান হয়ে যায়। সে বিভিন্ন জিনিস সামনে দেখতে পায়। কাজেই বিভিন্ন দিকেই তাঁর নজর আটকে যায়। কোথাও এ দৃষ্টি আটকায় আগ্রহ ও ভালবাসার ভিত্তিতে। আবার কোথাও আটকায় ভয়ভীতির ভিত্তিতে। আবার কোথাও তা হয় প্রত্যাশার ভিত্তিতে। এরপর 'কলব' ও 'নযর' এর এ পেরেশানী বিভিন্নতার পর যখন এটাকে 'জমার' অর্থাৎ একত্রিত হবার প্রশান্তি লাভ করা যায় তখন তার পেরেশানী একত্রিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তার হৃদয় আল্লাহর একত্বে ও খাঁটি ইবাদাতের উপর এসে জমে

যায়। ওই সময় তার মহব্বত, সাহায্য, ভয় ও আশা এবং তাওয়াক্কুলের অনুভূতি ওই একটি জাতওয়ালা সিফাতের উপর এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এ নিমগ্ন অবস্থায় কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, এ হৃদয় মাখলুকাতের দিকে তাকাবার ও খালিক মাখলুকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার সময়ও পায় না। আবার কখনো এমনও হয় যে, কালব হকের কেন্দ্রের উপর এসে বসে যায় এবং খালকের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এটা 'ফানাহ্র' দ্বিতীয় রকমের অর্থের সাথে একেবারেই সাদৃশ্যযুক্ত। আর ওটাই হৃদয়ের দুর্বলতার ফল।

এরপর 'জমার' আর এক রকম অর্থ আছে, তাহলো জাতে বারী তা'আলার উপর হৃদয় একাগ্রচিত্তে বসে যাবে। সেখানেও সে দেখতে পাবে সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর কুদরাতের উপর কায়েম আছে, আর তাঁর হুকুমে ও তদবিরে কার্যক্ষেত্রে চালু আছে। আর মাখলুকাতের সমগ্র আধিক্য এবং রকমারী জিনিস আল্লাহ তাআলার একত্বে বিলুপ্ত। সে আরো দেখতে পায় যে, আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বের পরওয়ারদিগার, মাবুদ, খালিক ও মালিক। এ ধরনের মন একদিকে ইখলাস, মহব্বত, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল ও ইসতেআনাত, হুব্বু লিল্লাহ ও বুগযু লিল্লাহর মালাকুতি আবেগ দ্বারা পরিপূর্ণ এবং জাতে খোদাওয়ান্দির উপর জমা হয়ে থাকে। অন্যদিকে খালিক ও মাখলুকের মধ্যে পার্থক্যও তার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে না। এটাই হলো সত্যিকারের গোলামী আর এটাই হলো কালেমা তাইয়েবার প্রকৃত স্পীরিট। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেবার বাস্তব অর্থ এছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এ জিনিস মনে 'গায়রুল্লাহর' মাবুদ হবার সামান্যতম কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। এর উপর আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়াতের খুবই গভীর ও চিরন্তন নকশা অংকিত হয়ে যায়। যেমন এক একটি মাখলুকের মাবুদ হবার নিষিদ্ধতা এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মাবুদিয়াতের পরিপূর্ণতা চিরন্তনতা প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। যার ফলে মন এমন এক জায়গায় এসে জমে যায় ও গায়রুল্লাহর পেরেশানজনিত সম্পর্ক হতে একেবারেই মুক্ত হয়ে যায়। এরপর এর সকল দৃষ্টির একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় আল্লাহই। তার যিকির-ফিকির, প্রেম-প্রীতি, মর্যাদা ইবাদাত, চাওয়া-পাওয়া, সন্তুষ্টি, নির্দেশ মানা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা সব অনুভূতির একমাত্র উদ্দেশ্য যে কা'বা, তার তাওয়াফে মশগুল হয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে তা এক মুহূর্তের জন্যও এ সত্যকে ভুলে যায় না যে, মাখলুকাত এ ঘটনাবহুল বিশ্বে নিজের পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখে, এমন অস্তিত্ব যা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব থেকে একেবারেই পৃথক।

বান্দাহ্ যখন এ স্তরে পৌঁছে তখন সে সঠিক অর্থে একত্ববাদী হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারটি একবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে সর্বোত্তম যিকির হলো ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

যিকিরের শরীআত বিরোধী পদ্ধতি

দুর্ভাগ্যবশত মানুষ যিকিরের ব্যাপারে ভুল মানসিকতা ও ধারণার কারণে খুবই বিপজ্জনক প্রদর্শনী করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট এরশাদ থাকার পরও তারা ধারণা পোষণ করে থাকে যে ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ যিকির শুধু সাধারণ লোকের জন্য। আর খাস খাস লোকদের যিকিরের পদ্ধতি হলো শুধু "আল্লাহ্" শব্দের অজিফা করা। আর খাসদের মধ্যেও যারা আরো খাস তাদের শব্দ উচ্চারণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য শুধু "ইয়াহু" "ইয়াহু" করাই যথেষ্ট। কিন্তু এটা স্পষ্ট ভ্রান্তি ও গোমরাহী। তারা তাদের এ দাবীর ব্যাপারে কুরআনের যেসব আয়াত থেকে দলীল পেশ করে তাতে মূলত কুরআনের অর্থের পরিবর্তন ও বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই তারা পেশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদের কয়েকটি দলীল নীচে দেয়া হলো।

قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ الانعام : ٩١

"(হে রাসূল!) বলো আল্লাহ্ (কিতাব নাযিল করেছেন)। তারপর তাদেরকে ছেড়ে দিন তারা তাদের যুক্তিবাদের খেলায়ই মেতে থাকুক।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯১

এ আয়াত দ্বারা তারা এ দলীল পেশ করে বলে দেখো, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, "বলো আল্লাহ্"। এর দ্বারা বুঝা গেলো শুধু "আল্লাহ্" "আল্লাহ্"বলাই যিকির হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু একটি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও যার কুরআনের শিক্ষা ও আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে, এ বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুভব করতে পারে যে, 'আল্লাহ্' শব্দ এখানে একা একা ব্যবহৃত হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তা একটা গোটা বাক্যের অংশ মাত্র। এ বাক্যের অবশিষ্ট অংশকে অবস্থান গত অবস্থার দাবী ও আলামত অনুযায়ী উহ্য রাখা হয়েছে। কারণ এসব শব্দের (قُلِ اللّٰهُ) আগের বাক্য হলো প্রশ্নবোধক। আর প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর সাধারণতঃ এভাবে দেয়া হয় যে, প্রশ্নবোধক বাক্যের বেশীর ভাগ শব্দ যেগুলো জবাবের বাক্যে আনা হয়, সেগুলোকে উহ্য রাখা হয়। যেমন এ বাক্যের গোটা অংশকে যদি প্রকাশ করা হতো তাহলে তা এরূপ হতো ঃ

قُلِ اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى -

কেননা এ বাক্যটি ওই ইহুদীদের প্রতিবাদে বলা হয়েছে, যারা নুযুলে কুরআনের ব্যাপারে বলতো - مَا اَنْزَلَ الَّذِىْ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ "আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের উপর কোনো জিনিস নাযিল করেননি।"

একথা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন যে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ মানুষের উপর নিজের কালাম নাযিল করেন না, তাহলে বলো ওই কিতাব যা মূসা আলাইহিস সালাম তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাযিল করেছিলো ?

এরপর আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ لا ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○ الانعام : ٩١

"হে নবী! বলে দিন আল্লাহ। অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি মূসার উপর কিতাব নাযিল করেছেন।"

এখন ইসমে মোযমের অর্থাৎ "ইয়াহু"-কে শরীআতসম্মত যিকির বলার ব্যাপারটা নিন। এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে তারা এ আয়াতকে পেশ করে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ م - ال عمران : ٧

"অথচ এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।"

এ আয়াতকে তারা তাদের ভুল ব্যাখ্যার অনুশীলন ক্ষেত্রে বানিয়েছে। তাদের মতে এ আয়াতের মতলব হলো, وَالرَّاسِخُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ অর্থ আল্লাহ রাসেখিন ফিল ইলমে (জ্ঞানের পারদর্শীগণ) ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর কালামের সাথে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে যা এখানে করা হয়েছে।

মোটকথা 'ইসমে জাহেরই' হোক অথবা 'ইসমে মুযমের'ই হোক না কেন, শুধু একটি শব্দ দ্বারা না সলফে সালেহীনদের কেউ যিকির করেছেন আর না নবী-রাসূলগণ একে শরীআতসম্মত বলেছেন বলে কোনো বর্ণনা আছে। কারণ একটি শব্দ দ্বারা কোনো বাক্য গঠিত হয় না। এর দ্বারা কোনো অর্থ বুঝা যায়না। এজন্য এটাকে ঈমান অথবা কুফরের ভিত্তি বলা যেতে পারে না। একটি শব্দ শুধু ধারণা সৃষ্টি করতে পারে । যে ধারণার দ্বারা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কোনো হুকুম নির্দেশ করা যায় না। যদি আগ

থেকেই মনে কোনো পরিচয় ও অবস্থা বিদ্যমান না থাকে, যা এ শব্দটি মিলে একটি নির্দিষ্ট অর্থ সৃষ্টি করে। নতুবা সাধারণ অবস্থায় একটি শব্দ কি হৃদয়কে শুধু একটি ধারণা দেয়া ছাড়া আর কোনো পরিপূর্ণ কথা ও নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না ? অথচ শরীআত যত প্রকার যিকিরের তালীম দিয়েছে, তার সবগুলোই এমন যা স্বয়ং নিজে অন্য কোনো জিনিসের সাহায্য ছাড়া পরিপূর্ণ কথার অর্থ প্রকাশ করতে পারে, সে আমাদেরকে আলোচ্য যিকিরের ব্যাপারে দুধারী তরবারী চালাবার কোনো অনুমতি দেয়নি। বস্তুত আমরা দেখছি যে, যেসব লোক এ বিপজ্জনক খেলা খেলছে তারা এ তরবারী দিয়েই তাদের নিজের গর্দান দু টুকরো করে কেটেছে। তাওহীদ ও মারেফাতে ইলাহীর উচ্চতর মাকামে পৌঁছার পরিবর্তে বিভিন্ন রকমের ইলহাদ (কুফরী) ও আকীদার অভিশপ্ত গোমরাহীতে গিয়ে ফেঁসে গেছে। বিশেষ করে ইসমে মুয্মের অর্থাৎ 'ইয়াহু' 'ইয়াহু' যিকির তো বিপজ্জনক ফিতনার উৎসমুখ। এ তরিকার যিকিরের সাথে নবীদের তরিকার যিকিরের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং তা আপাদমস্তক বিদআত ও গুমরাহী। কারণ যে ব্যক্তি "ইয়াহু" "ইয়াহু" শব্দ বার বার উচ্চারণ করতে থাকে এবং আল্লাহর মূল নাম না নেয়, তখন তার এ সন্দেহযুক্ত কথায় "হু" এর যমীরের ইশারা শুধু ওই জিনিসই হতে পারে, যার ধারণা আগ থেকেই তার মনে গেড়ে আছে। আর এটা একটা স্পষ্ট কথা যে, প্রত্যেকটা হৃদয়ে সবসময় যাতে "ইলাহীর" সঠিক ধারণা রাখা ও নূরে হক-এ ভরে যাওয়া জরুরী নয়। সে কখনো গুমরাহ হয়ে যায়, কখনো হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। কখনো মাবুদ ও মা'বুদিয়াতের সঠিক ধারণা পায়, কখনো আবার ভুল ধারণা করে। এ কারণে "ইয়াহু" বলতে থাকার অর্থ অবশ্যম্ভাবী রূপে এক আল্লাহর ডাক নাও হতে পারে। বরং একথার সম্ভাবনা আছে যে, যে 'জাত'কে সে ডাকছে তার ধারণা তার মনে ওই ধারণা হতে বেশ দূরে যা এক আল্লাহ লা-শারীক এর প্রকৃত ধারণা। তাই যিকিরের এ রীতি পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের ঈমানের শত্রুর বিপদাপদ দ্বারা বেষ্টিত। একা একটি শব্দ দ্বীনের মধ্যে কোনো মর্যাদা রাখে না। 'জমহুর আহলে ইসলাম' একথায় একমত যে, শুধু একটি শব্দ 'আল্লাহ' বলে দিলেই কাউকে মু'মিন বলা যাবে না। এ কারণেই দিবালোকের মত স্পষ্ট শরীআত কাউকে শুধু একটি শব্দ দ্বারা যিকির করার অনুমতি দেয়নি।

এখানে কুরআনে মাজীদের এসব আয়াত থেকে কোনো সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। যেসব আয়াতে "নিজের রবের নামকে স্মরণ করো" শব্দে

ব্যবহার করা হয়েছে এসব আয়াতে যিকরে ইস্‌ম বা নাম স্মরণ করার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, শুধু আল্লাহ্ শব্দ বার বার বলতে থাকো। বরং স্বয়ং কুরআনের মোবাল্লেগ ও ব্যাখ্যাদাতা এ যিকিরের অর্থ ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদেরকে বলেছেন যে, এ 'যিকরে ইসম'-এর অর্থ এ ধরনের বাক্যের অজিফা যা আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও তার তাসবীহ্ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত যখন ঃ ৭৪ : فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ - واقعة এ-আয়াত নাযিল হয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "এ হুকুম অনুসারে তোমরা রুকূ'তে আমল করো।"

যখন ১ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى - اعلى এ আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি এরশাদ করলেন, এ হুকুম অনুসারে তোমরা সাজদায় আমল করো।

এরপর এসব আমলের উপর আমল করার পদ্ধতি এভাবে বলে দিয়েছেন যে, রুকূ'তে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়বে।

বুঝা গেলো 'ইসমে রব'-এর তাসবীহ্ অর্থ হলো এমন ধরনের বাক্যের অজিফা আদায় করা যা আল্লাহ্ তা'আলার 'হামদ' ও পবিত্রতার অর্থ বহন করে। শুধু 'আল্লাহ' একটি শব্দের যিকির নয়। নামাযে, আযানে ঈদে ও হজ্জের রসম-রেওয়াজে যেসব যিকির-আযকার নির্দিষ্ট ও শরীআতসম্মত করা হয়েছে তার সবগুলোই পূর্ণ বাক্যে শেষ করা হয়েছে। শুধু একটি শব্দের আকৃতিতে নয়। শুধু একটি শব্দের আকারে চাই, তা ইসমে জাহের হোক অথবা যমির (বিশেষণ) এদের যিকিরের শরীআতের কোনো ভিত্তি নেই। এ সবকে যদি আকাবির আওলিয়া আরেফিনে কামেলীনের খাস তরিকায়ে যিকিরও বলা হয় তবুও এসব তো নানা ধরনের বিদআত ও গুমরাহীর উৎসমুখ।

দীনের সঠিক পথ

আমি উপরে বর্ণনা করে এসেছি যে, দীনের বুনিয়াদ দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে, একটি হলো ঃ আল্লাহরই বন্দেগী করতে হবে। দ্বিতীয় হলো ঃ আল্লাহর বন্দেগী এমন পদ্ধতিতে করতে হবে, যা শরীআতসম্মত। নিজের মনগড়া ও বেদআতী পদ্ধতিতে নয়।

নীচের আয়াতটিতে এ সত্যই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا

"অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশা পোষণ করবে, সে যেন আমলে সালেহ করে আর নিজের রবের বন্দেগীতে কাউকে শরীক না বানায়।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ১১০

শাহাদাতের উভয় কালেমাতেই 'জাহের' ও 'বাতেন' উভয় দিক এ অর্থই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে কালেমায়ে তাইয়্যেবা, প্রথম কালেমায় اِلٰهَ। لَا اللّٰهُ। اِلَّا। বাক্যে একথার স্বীকৃতি আছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদার্ত করি না।

আর কালেমায় শাহাদাত অর্থাৎ দ্বিতীয় কালেমাতেও আমরা একথার সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ওই নবী— যিনি মাবুদে বরহকের আহকাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

এ কারণে তাঁর এরশাদের সত্যতা আর তাঁর আহকামের অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহর নবী তাঁর নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এসব কথা ও পদ্ধতিকে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এরই আলোকে একজন বান্দাকে তার নিজের মাবুদের ইবাদাত করা দরকার। আর ইবাদাতের মনগড়া নিয়ম-পদ্ধতি নির্মূল করে দেয়া দরকার। যেসবের কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। যেমন এসব সঠিক বিধান আমরা পালনে বাধ্য যে, শুধু আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। সব ব্যাপারে তার উপরই ভরসা করতে হবে। সাহায্য চাইতে হবে তাঁর কাছেই। ডাকতেও হবে তাঁকে। তাঁকেই বানাতে হবে সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মূল কেন্দ্র। বন্দেগী করতে হবে শুধু তাঁরই। ঠিক একইভাবে আমাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, রাসূলের অনুসরণ করতে হবে বিনা বাক্যে। তাঁর আহকামের পাবন্দী করতে হবে। তাঁর নকশে কদমকে পথ প্রদর্শনকারী হিসবে গণ্য করতে হবে। যা তিনি হালাল করেছেন তাকেই হালাল জানতে হবে। আর ওইসব জিনিসকেই হারাম জানতে হবে যা তিনি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। দীন হিসেবে শুধু ওইসব জিনিসকে মানতে হবে। তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা যেসব জিনিসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোটা কুরআন এসব হাকীকত এবং দীনের ভিত্তির বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূর্ণ। কুরআনের যে পাতাই উল্টান না কেনো ইবাদাত-বন্দেগীর এ অর্থই সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে।

"ইবাদাত' 'ইনাবাত' (আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া) 'খাশিয়াত' (ভয়ভীতি) 'ইস্তেয়ানাত' (সাহায্য চাওয়া) 'তাওয়াক্কুল' 'খাওফ' ও তাকওয়ার যেখানেই উল্লেখ আছে, প্রত্যেকটির সম্পর্ক হবে আল্লাহ

জাল্লাশানুহুর দিকে। শুধু দুটো জিনিস এমন আছে যার মধ্যে আল্লাহর সাথে তাঁর রাসূলও শরীক আছেন। এর একটি হলো আনুগত্য আর অপরটি হলো মহব্বত। অর্থাৎ এতায়াত ও মহব্বত যেভাবে আল্লাহকে করতে হবে ঠিক সেভাবে রাসূলেরও করতে হবে। বাকী সব জিনিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অর্থেই আল্লাহর শরীক নয়। বরং সাধারণ মানুষের মতো তিনিও এ কাজে আদিষ্ট যে, আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে। তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তার নিকটই সকল নিবেদন পেশ করতে হবে। খৃস্টান প্রভৃতি জাতিকে শয়তান বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলো যার ফলে তারা তাদের আম্বিয়া আওলিয়াকে তাদের সঠিক স্থানে রাখতে পারেনি। আল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীক এর বিশেষ সিফাতে তারা তাদেরকেও শরীক করে দিয়েছে। তারা তাদের থেকে দোয়া চাওয়া এবং তাদের উপর তাওয়াক্কুল করতে শুরু করে। কিন্তু নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেছেন। তারা সিরাতুল মুসতাকীমের উপর চলে অভিশপ্ত ও গুমরাহদের মধ্যে গণ্য হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তারা দীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছেন। নিজের মাথাকে তাঁরই দরবারে ঝুঁকিয়েছেন। বিপদে তাঁকেই ডেকেছেন। তার নিকটই নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার ফরিয়াদ করেছেন। তাঁর দরবারেই অসহায়ের মতো মাথা অবনত করেছেন। নিজের সব ব্যাপারকে তারই সাথে সম্পর্কিত করেছেন। প্রতি কদমে তাঁর উপরই পূর্ণ ভরসা করেছেন। আবার তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছেন। তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। তাঁকে তাযীম ও তাকরীম করেছেন। তার সাথে বন্ধুত্ব ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর করেছেন। ঘোর বিপদে তাঁর জন্য জীবন বাজী রেখেছেন। নিজের আমলী জিন্দিগীতে তাঁর হিদায়াতের উপরই কাজ করেছেন। তার জ্বালানো মশাল হাতে করেই জীবনের সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন।

এ হলো সে 'দীন ইসলাম' যার তাবলীগ ও প্রচারের জন্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছিলেন। যে দীন ছাড়া আল্লাহর দরবারে আর কোনো দীন গ্রহণীয় নয়। আর এটাই হলো ইবাদাতের মূল কথা। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত প্রত্যেক মু'মিনকে এ সত্য অনুধাবনের শক্তি দান করুন। এ অনুযায়ী নিজ নিজ জীবন গড়ে তোলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় কদম দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

তাফহীমুল কুরআন-(১-১৯ খণ্ড)
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

তাফহীমুল কুরআন (১-৬ জেলদ)
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

তরজমায়ে কুরআন মজীদ
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

কুরআন শরীফ (আরবী)

শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
-মাওলানা হাবিবুর রহমান

শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
-মতিউর রহমান খান

সহীহ্ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
-আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (র)

সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
-ইমাম আবু আবুদল্লাহ ইবনে মাজা (র)

শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
-ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)

সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
-আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

আসমাউল হুসনা
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

খেলাফত ও রাজতন্ত্র
-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনা
-জাষ্টিস মালিক গোলাম আলী